শিশু মনে
মায়ের প্রভাব

SHISHU MANE MAYER PRABHAB

শিশু মনে মায়ের প্রভাব

শ্রীরামপ্রসাদ

: পরিবেশক :

ত্রয়ী

৭৩, মহাত্মা গান্ধী রোড

কলিকাতা-৭০০০০৯

উৎসর্গ

আমার পরম আরাধ্য পিতৃদেব

ও

পরম আরাধ্যা মাতৃদেবী

করকমলেষু—

নির্ম্মলা সুন্দরী দাসী

মায়ের সঙ্গে সন্তানের সম্পর্ক খুব নিবিড। আর এই সম্পর্ক আরও নিবিড় হয় যখন মা গল্পকথায় শিশুর মন ভরিয়ে তোলেন।

আমার যখন বয়স ৫।৬ বৎসর তখনকার কথা আমার একটু একটু মনে পড়ে। তখন মা আমায় নানারকম গল্পচ্ছলে উপদেশ দিতেন। সেই সব কথা আমাব সব মনে নেই, তবুও কিছু কিছু আমার বেশ মনে আছে।

* * *

মাঝে মাঝে মা আমায ভাত খাওয়াতেন আর নানারকম কথা বলতেন। মনে পড়ে একদিন মা খাওয়াতে খাওয়াতে আমায় বললেন, "ভগবান না খাওযালে খাওযা যায় না।" এই বলে মা এক গল্প আরম্ভ করলেন—

এক সময় একজন লোক শ্বশুর বাড়ী যাচ্ছে, যেতে যেতে দেখে যে, আর একজন লোক নদীর ধারে বসে বালি মাপছে, জামাইটি এই দেখে তাকে জিজ্ঞাসা করল যে, "তুমি বেশ বালি মাপছ।" সে বলল, "আমি যদি কোনদিন একজনার বালি না মাপি তাহলে আর তার সেদিন খাওয়া হয় না।" তখন জামাই তাকে বললো, "তুমি আজ আমার বালি মেপ না। দেখি, কেমন আমি খেতে না পারি।" সে তখন বললে, "আচ্ছা।" তারপর জামাই শ্বশুর বাড়ী গিয়ে উঠেছে। একটু বিশ্রাম করে সে শালার সঙ্গে খাওয়ার ঘরে ঢুকেছে, তখন তার শাশুড়ী থালা ভরে খাবার এনে জামাইকে দিলেন, তখন জামাই বালি মাপার লোকটার কথা মনে করে হাসতে লাগলো। তখন শালা তাই দেখে

ভাবলো, জামাইবাবু বুঝি আমার মাকে দেখে হাসছে। তখন সে তাকে মারতে মারতে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিল।

জামাই সেখান থেকে বাড়ীর দিকে রওনা হলো. বাড়ী যেতে যেতে আবার সেই লোককে বালি মাপতে দেখলো, তাকে দেখে জামাই বললো, "তুমি আমার জন্য বালি মেপে রেখো, আমি যেন বাড়ী গিয়ে দুটো খেতে পারি। সে বললে, "আচ্ছা", তারপর তার বাড়ী গিয়ে খাবার জুটলো।

* * *

মা প্রায় বলতেন, ভক্তি আর বিশ্বাসে সমস্ত কিছু হয়।

এ কথা গল্পচ্ছলে মা আমায় বুঝিয়েও দিতেন। একদিন মা দুর্গা শিবকে জিজ্ঞাসা করলেন, "দেখ, গঙ্গার কি গুণ?" তখন শিব বললেন, "আচ্ছা তোমায় আমি তা দেখাচ্ছি।" এই বলে শিব গঙ্গার ধারে গলিত কুষ্ঠ রোগী হয়ে বসে থাকলেন, আর মা দুর্গাকে বললেন, "তুমি যে লোককে গঙ্গায় স্নান করতে দেখবে তাকেই বলবে যে, বাবা আমার স্বামী রোগে বড় কষ্ট পাচ্ছে, তা তোমরা যদি এনাকে একবারটি গঙ্গায় জলে স্নান করাতে পারো, তাহলে আমার স্বামীর রোগ সেরে যায়। কিন্তু একটা কথা. তোমরা যদি কোন পাপ করে থাকো, তাহলে কিন্তু আমার স্বামীকে ধরো না।" তখন অনেক লোকই প্রথম কথা শুনে রাজী হতে লাগলো কিন্তু দ্বিতীয় কথা শুনে আর রাজী হয় না।

ইতিমধ্যে একজন খুব বদ লোক সেই রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল. তাকে দেখে দুর্গা বললেন, "বাবা, আমার স্বামীকে যদি তুমি গঙ্গায় নিয়ে গিয়ে স্নান করাতে পারো, তাহলে আমার স্বামীর রোগ সেরে যায়; কিন্তু তোমার দেহে কোন পাপ থাকলে একে স্নান করিয়ো না।" তখন

সেই লোকটি শুনে বলল—"দাঁড়াও, আমি আগে গঙ্গা থেকে স্নান সেরে আসি, তারপর তোমার স্বামীকে স্নান করাব।" লোকটির দৃঢ় বিশ্বাস যে গঙ্গায় স্নান করলে শরীরে আর কোন পাপ থাকে না। তাই সে মনে করলে গঙ্গায় যদি স্নান করে আসি তাহলে আমার সমস্ত পাপ চলে যাবে এবং তারপর একে নিয়ে যাবো। এই বলে সে স্নান করতে চলে গেল। তখন শিব ও মা দুর্গা অন্তর্ধান করলেন এবং শিব দুর্গাকে বললেন, "এই যে এত লোক গঙ্গায় স্নান করলো; কিন্তু ফল লাভ করলো মাত্র এই লোকটি।"

* * *

মা আমায় শিবের আর একটা গল্প বলেছিলেন—একজন লোক একটা পাথরকে শিব বলে খুব ভক্তি করতো ও পূজা করতো। সেই পাথরের জন্য পয়সা খরচ করে নানারকম সোনার গহনা তৈরী করিয়ে তাকে পরিয়েছিল।

একদিন রাত্রিতে এক চোর ছোরা নিয়ে তাকে ভয় দেখিয়ে সেই পাথর থেকে সমস্ত গহনাপত্র নিয়ে যাচ্ছিল; তখন লোকটা মনে মনে শিবকে ডাকলো, আর বললো, "বাবা, তুমি এর বিচার করো।" তখন বাবা সেই পাথর থেকে ত্রিশূল নিয়ে বের হলেন, চোর তাই দেখে পালালো।"

মা তাই বলতেন, "ভক্তি আর বিশ্বাসের জন্যই বাবা তাকে সেই বিপদ থেকে মুক্ত করলেন।

* * *

আর একটা গল্প মনে পড়ে এই প্রবাদে, একবার ৫।৭ জন মহিলা একসঙ্গে তীর্থ করতে যান। তাদের মধ্যে একজন ছিলেন খুব ভক্তিমতী ও বিশ্বাসী। তখনকার দিনে রেলগাড়ী ছিল না বলে সকলেই হেঁটে তীর্থ করতো। ভক্তিমতী মহিলাটির চলতে দেরী হওয়াতে সকলে তাকে ফেলে চলে গেল। সে একলা পথ চলতে চলতে রাত্রি হয়ে গেল। তাই সে ভাবল, আর এখন কি করে যায়। তাই সে ওখানে এক সাধুর আড্ডার কাছে গিয়ে বললো, "বাবা, আমার সব সঙ্গী আমাকে ফেলে দিয়ে চলে গেছে। তাই বলছি যে, তোমাদের এখানে আজ আমি রাত কাটাবো।" তখন তারা বললো, "বেশ"। সে একপাশে বসে ভগবানের নাম করতে লাগলো। তারপর মহিলাটি দেখে যে, একে একে সমস্ত সাধুই চলে যাচ্ছে। কেবল মাত্র একজন থাকলো এবং সেই সাধুটি নানারকম ভাবে তাকে ভয় দেখাতে লাগলো। মহিলাটির সেই দেখে খুব ভয় হলো এবং সে কেবল ভগবানকে ডাকতে লাগলো, "ভগবান আমার লজ্জা নিবারণ করো।" তখন একটা প্রকাণ্ড বাঘ বন থেকে বেরিয়ে আসলো এবং সেই সাধুটির গলা কামড়িয়ে নিয়ে গেল।

*　　　*　　　*

মা বলতেন, "ঠিক ঠিক ডাকতে পারলে ভগবান সাড়া দেবেন-ই দেবেন।"

একবার এক গ্রামে গুরু এসেছে। তাই সেই গ্রামের লোকেরা অন্ধকার থাকতে থাকতে পুকুরে স্নান করতে গেছে। এক পাগলী সকালে তাদের স্নান করা দেখে তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলো, "তোমরা এত সকাল সকাল স্নান করতে এসেছ কেন?" তারা বললো যে, তারা আজ মন্ত্র

নেবে। সেই পাগলীটি তাদের কথা শুনে বললো, "আমিও মন্ত্র নেবো।" তাই সে স্নান সেরে গুরুর কাছে গেল আর বললো, "আমাকে মন্ত্র দিতে হবে।" তাকে নাছোড়বান্দা দেখে গুরু তাকে এই মন্ত্র দিলেন— "ধর—ছাগল পাতা খা, আর ভজতে ভজতে স্বর্গে যা।" পাগলীটি তারপর থেকে রোজ এক ঝুড়ি পাতা কুড়িয়ে নিয়ে আসে. আর একটা করে পাতা ফেলে আর বলে, "ধর—ছাগল পাতা খা, আর ভজতে ভজতে স্বর্গে যা।" ঠিক সেই সময়ে এক ছাগল এসে সমস্ত পাতা খেয়ে চলে যায়।

এক বৎসর পর আবার সেই গুরু এসেছে এবং তাকে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, "ওরে কেমন নাম করছিস ?" তখন সে সব বললে। তার কথা শুনে গুরু একদিন চুপি চুপি গিয়ে দেখেন, এক জ্যোতির মত আলো এসে ছাগল হয়ে যায় এবং তারপর আস্তে আস্তে সমস্ত পাতা খেয়ে যায়।

মা তাই বলতেন যে, পাগলই হোক ছাগলই হোক, ঠিক ঠিক যদি ভক্তি ভরে তাঁকে ডাকা যায়, ভগবান তাকে সাড়া না দিয়ে পারেন না।

* * *

এক গুরুর অনেক শিষ্য ছিল। তার এক শিষ্যের বাড়ীতে খুব অসুখ, তাই সেই শিষ্য গুরুকে তার বাড়ীতে ডেকে আনলো। সে গুরুকে খুব ভক্তি আর বিশ্বাস করতো। সে ভাবতো গুরুই তার ভগবান। গুরু তার বাড়ীতে এলে, গুরুর পদধূলি নিয়ে রোগীর মুখে দিল ; কিন্তু এর আগেই ডাক্তার তাকে জবাব দিয়ে গেছে। গুরু তার বাড়ীতে, তাই তার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মালো যে, আর রোগীর কোন ভয় নেই ! তারপর রোগী আস্তে আস্তে ভাল হতে লাগলো এবং কিছু দিনের মধ্যে সম্পূর্ণ ভাল হয়ে গেল।

সেই গ্রামে আর এক শিষ্যের বাড়ীতেও খুব অসুখ, সে রোগীও যায় যায়। তাই শিষ্য গুরুকে তার বাড়ীতে নিয়ে গেল এবং গুরু ভাবলো, আমার জন্যই যখন ও রোগী সেরেছে তখন এ রোগীও সারবে। তাই গুরু গিয়ে তাকে আশীর্বাদ করলো, কিন্তু তাতে ফল হলো না। তখন সেই আগের শিষ্য সেই কথা শুনে বিশ্বাস করতে পারলো না এবং সে নিজে গিয়ে গুরুর পদধূলি নিয়ে তাকে খাওয়ালো। তারপর রোগীও আস্তে আস্তে ভাল হয়ে গেল। তখন গুরু বুঝতে পারলেন যে, এ সমস্ত শিষ্যেরই ভক্তি ও বিশ্বাসের ফলে হয়েছে।

* * *

একবার এক চোর রাত্রিতে চুরির সন্ধানে ঘুরছে। সেই সময়ে সেই রাস্তা দিয়ে একজন সাধু যাচ্ছে। সাধুকে দেখে চোরটি লুকাবার জায়গা খুঁজছে। তাই দেখে সাধু তাকে বললে, "কি হে, তোমার ভয় কি? আমিও একজন চোর।" তখন চোরটি বললে, "বেশ বেশ, বোঝই তো, চোরের কি ভয়? তা তোমার সন্ধানে কিছু আছে নাকি?" সাধু তাই শুনে বললে, "হাঁ আছে ভাই, বৃন্দাবনে এক গাছের ডালের উপর একটি ছোট ছেলে বসে থাকে। তার কাছে যদি তুমি এক ঝুড়ি খাবার দিতে পারো, তাহলে সে তোমায় সমস্ত গহনা দিয়ে দেবে।" সেই চোরটি তাই শুনে বৃন্দাবনে এক ঝুড়ি খাবার নিয়ে গেছে এবং ছোট ছেলেটিকে সমস্ত খাবার খাইয়ে একটি একটি করে সব গহনা চোর নিয়েছে। সমস্ত নেওয়া হলে ছেলেটি বলেছে,—"আর গহনা নেবে না কি?" তারপরই বলেছে, "আমার মুখের দিকে তাকাও তো।" তার মুখের দিকে তাকানো মাত্র চোরটির দিব্যজ্ঞান হয়ে গেল এবং সে সমস্ত

ফেলে দিয়ে বলল, "তুমি আমায় এখন যা দিলে, তার তুলনায় এসব মিথ্যা।" এই বলে সে সাধু হয়ে গেল এবং ভগবানের নাম করে জীবন কাটিয়ে দিল।

* * *

একবার মা আমাদের কাছে সংসারের নানা কথা বলছিলেন, বলতে বলতে আমাদের কাছে একটা সংসারের গল্প বললেন।

এক সংসারে এক বুড়ো-বুড়ী ও তিন ছেলে ছিল। বুড়ো মারা যাওয়াতে বুড়ীর ভারী কষ্ট হলো এবং কাঁদতে কাঁদতে অন্ধ হয়ে গেল। তখন বুড়ীর দুজন ধনী ছেলে এসে বলল, "তুমি আর কেঁদ না, আমরা তোমায় খুব যত্ন করে রাখব।" একজন বলল, "আমি তোমায় খাওয়াব" আর একজন বলল, "আমি তোমায় কাপড় দেব, থাকবার ভাল জায়গা দেব।"

তারপর একদিন বুড়ী ছোট ছেলের কাছে গিয়ে বলল, "বাবা, তুই আমায় কি দিবি?" ছোট ছেলে বলল, "মা, আমার তো টাকাও নেই কড়িও নেই। তা আমি তোমায় কৃষ্ণ ঠাকুর দেখাব মা।" তারপর অনেকদিন পর আবার ছোট ছেলের সঙ্গে মায়ের দেখা হয়েছে। তখন মা বলল, "আমি তো অন্ধ, তুই আমায় কি কৃষ্ণ ঠাকুর দেখাবি রে।" ছেলে মাকে জিজ্ঞাসা করল, "মা, তুমি এখন দেখবে?" এই বলে বাঁশী বাজাতে লাগলো। কৃষ্ণ ঠাকুর সঙ্গে সঙ্গে এসে হাজির এবং মা-র চোখও খুলে গেল এবং কৃষ্ণকেও দর্শন করতে পারলো। মা তখন ছেলেকে কোলে করে নিয়ে কত আদর যত্ন করতে লাগলো, আর বলল

যে, "বাবা তুই যা আমার করলি, তা যে কেউ করতে পারে না। তুই আমার বাবা।" বলে কত চুমু খেতে লাগলো।

মা আমাদের মাঝে মাঝে বলতেন, "টাকা দেখতেও গোল, করেও গোল কাজেও গোল।" তিনি একটা গল্প বলেছিলেন এই সম্বন্ধে—

এক ব্যাঙ এক জায়গা থেকে একটা টাকা পায়। সে সেই টাকাটা পেয়ে তার গর্তের মধ্যে রেখে দেয়। সেই টাকার জন্য তার মনে মনে ভীষণ অহঙ্কার হয় এবং সে রোজ ওখানকার রাজার ঘোড়াকে লাথি মেরে আসে। রাজা রোজ এইরকম দেখে তার এক চাকরকে বললেন যে, "ও কোথায় যায় দেখে এস তো।" চাকরটি দেখে যে, ব্যাঙ কাছেই এক গর্ততে প্রবেশ করলো এবং সেই গর্তের মধ্যে একটা টাকা দেখতে পেয়ে রাজাকে গিয়ে সমস্ত বললো। রাজা তাকে বলল যে, 'কাল যখন ব্যাঙটা এখানে আসবে তখন তুই গিয়ে ঐ টাকাটা নিয়ে আসবি।" সে রাজার কথানুযায়ী টাকাটা পরের দিন গিয়ে নিয়ে এলো। ২।৩ দিন হয়ে গেল, কিন্তু ব্যাঙটা আর আসছে না দেখে রাজা চাকরকে ব্যাঙটার গর্তে গিয়ে দেখে আসতে বললেন। চাকর গিয়ে দেখে যে, ব্যাঙটা মরে পড়ে আছে। রাজা বুঝলেন যে, ব্যাঙটা টাকার শোকে মরে গেছে। ব্যাঙের মত মানুষেরও টাকাতে এরূপ হয়ে থাকে।

* * *

মা আর একটা ব্যাঙের গল্প শুনিয়েছিলেন। সেটা হচ্ছে যে একটা ব্যাঙ সমুদ্রে থাকতো ; কিন্তু হঠাৎ একদিন সমুদ্র থেকে উঠে বেড়াতে বেড়াতে এক কুয়াতে পড়ে যায়। পড়ে গিয়ে দেখে, সেখানেও একটা

ব্যাঙ আছে। কুয়ার ব্যাঙটা সমুদ্রের ব্যাঙকে দেখে বলল, "দেখতো আমার জায়গা কত ভালো এবং কত জল। তুমি এখানে থাকো।" তখন সমুদ্রের ব্যাঙ বললে, "না হে, তোমার আর এ জায়গা কি। তুমি আমার জায়গাতে চল, দেখে অবাক হবে।" এই কথা শুনে কুয়ার ব্যাঙ তাকে ঠাট্টা করতে লাগলো এবং নানারূপ কটু কথা বলল। তখন সমুদ্রের ব্যাঙ দেখলে এর সঙ্গে বকা আর না বকা সমান। সে আস্তে আস্তে কুয়া থেকে উ ঠ চলে গেল।

এর থেকে বোঝা যায় –যে সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ রাখতে চায়, তাকে বিশ্বরূপ দর্শন করানো দুরূহ।

* * *

মা বলতেন, "ভগবানের নামেও অনেক সময়ে অনেক বিপদ থেকে মুক্ত হওয়া যায়। এই সম্বন্ধে একটা গল্পও বলেছিলেন—

একজন খুব ধনী ভক্ত লোক ছিল। তার কুষ্ঠিতে লেখা ছিল যে, সে মেঘের বাজের আঘাতে মারা যাবে। কিন্তু নির্দিষ্ট দিনে তার মাথায় বাজ না পড়ে একটা থান ইঁট মাথার উপর পড়ল। সে একেবারে মরবার মত হলো। ডাক্তার এলেন এবং খুব যত্ন নিয়ে চিকিৎসা করে বলে গেলেন যে, বাড়ীর রাস্তার উপর দিয়ে যেন কোন গাড়ী ঘোড়া না যায়, এবং কেহ যেন কোন শব্দ না করে। যদি কোন শব্দ-টব্দ হয়, তাহলে রোগীকে বাঁচানো কঠিন হয়ে পড়বে। তারা ছিল বড়লোক এবং তাদের কথা দশজন লোকও শুনতো। তারা ডাক্তারের কথানুযায়ী সমস্ত ব্যবস্থা করল এবং আস্তে আস্তে রোগী আরোগ্য লাভ করলো।

মার এই গল্পটা বলার উদ্দেশ্য ছিল যে, সেই ধনীলোক খুব ভগবানের নাম করতো। ঈশ্বরের উপর ভক্তি থাকার দরুণ সে সেই বিপদ থেকে মুক্তি পেল এবং এই জীবনে ভগবানকে ডাকবার সুযোগ পেল, অর্থাৎ নিজে আরও ভালো হবার সুযোগ পেল।

* * *

এক জায়গায় একজন লোক খুব ভগবানের নাম করতো। আর তারই পাশে আর একজন খারাপ লোক ছিল।

ভগবানের যে নাম করতো সে ভাবতো, আর আমার ভয় কি, আমি তো উদ্ধার হয়ে গেছি। আমার এত ভক্তি, এত ভগবানের নাম করি। কিন্তু খারাপ লোকটিও ভগবানের নাম করতো; অবসর সময়ে ভাবত, আমি যে এত পাপ করছি তার জন্য কত শাস্তিই না মৃত্যুর পর পাব এবং ভগবানের কাছে তখন মাপও চাওয়া যাবে না। কারণ, এত খারাপ কাজ করে কি ভগবানের কাছে মাপ চাওয়া যায়? তারপর একদিনে হঠাৎ তাদের দুজনের মৃত্যু হয়। তখন দেখা গেল, খারাপ লোকটিকে ভগবানের চর নিতে এসেছে, আর ভালো লোকটিকে যমের চর নিতে এসেছে। ভাল লোক তাকে দেখামাত্র বলছে, "তুমি ভুল করে আমায় নিতে এসেছ, তুমি ওকে নেবে না? আমাকে নিতে এসেছ কেন? যাও, তুমি এখনই ওর কাছে চলে যাও। আমাকে ভগবানের লোক নিতে আসবে।" তখন যমের লোক তাকে বুঝিয়ে ছিল যে, "তোমার যে এত অহঙ্কার ছিল তার জন্য পতন হল এইখানে। তোমাকে আমিই নিয়ে যাবো।" এই বলে যমের লোকই তাকে যমের কাছে নিয়ে গেল।

মার এই গল্পটা বলার অর্থ হচ্ছে যে, কোনটাতেই অহঙ্কার কখনও করতে নেই। টাকা থাকলেও অহঙ্কার করতে নেই। কারণ, টাকা আজ আছে, কাল নেই।

এইরূপ সব ক্ষেত্রেই অহঙ্কার ত্যাগ করতে হয়।

* * *

মা একবার এক নাপিত ও আর এক রাজার গল্প দিয়ে একটি বিষয় আমাদের বুঝিয়ে দিয়েছিলেন—

একই সময়ে এক দেশে এক নাপিতের ও রাজার পশ্চাদ্দেশে ফোড়া হয়। রাজার ফোড়া হয়েছে, কত দেশ থেকে কত রকম ডাক্তার আসলো এবং কত রকম ঔষধ খেল। এ রাজার জন্য ভেলভেটের গদি দিয়ে বিছানা তৈরী হলো। কিন্তু নাপিত দেখলো যে যদি ফোড়া হয়েছে বলে বাড়ীতে বসে থাকি তাহলে আমার পরিবারের পেট চলবে না। তাই সে সকাল না হতে হতেই বেরিয়ে গেল এবং রোজকার মত কাজ করতে লাগলো।

রোজই সে ঐ ফোড়া নিয়ে চেপে বসে কাজ করে এবং রাত্রিতে ক্লান্ত হয়ে এসে ঘুমিয়ে পড়ে। আবার সকালে উঠেই বেশ কাজ করে। আস্তে আস্তে এই রকম করতে করতে তার ফোড়া মিলিয়ে গেল। তার কোন কষ্টই গায়ে লাগলো না।

আর রাজা গদির উপর ছট-ফট করে এবং রাত্রিতে ঘুম হয় না। তার ভীষণ কষ্ট হয়; কিন্তু যত্নের তার কোন ত্রুটি নেই।

* * *

* * *

মা একবার বলেছিলেন যে, কোন ধনী লোক ও তার সাধু-গুরু সেকেণ্ড ক্লাস ট্রেনে করে যাচ্ছিলেন। এমন সময় এক স্টেশন থেকে এক সাহেব উঠল এবং সাধুকে দেখে গালাগালি দিল এবং নামতে বলল। তখন তার শিষ্য খুব রেগে গেল এবং বলল, "আমাদের টিকিট আছে।" তখন সাধু কিছু না বলে শিষ্যকে নিয়ে নেমে প্ল্যাটফর্মের এক চেয়ারে বসলেন। গাড়ীও আর ছাড়ে না, রেলের লোকেরা ভাবল, গাড়ী খারাপ হয়ে গেছে ; কিন্তু গাড়ী খারাপের কোন লক্ষণই দেখল না। গাড়ী আর কিছুতেই চলে না। তখন শিষ্য বুঝতে পারল এবং বলল 'আমার গুরুকে যতক্ষণ না উঠতে দেওয়া হবে, ততক্ষণ গাড়ী আর চলবে না।" সাহেব ও গাড়ীর লোকেরা তখন ওঁকে ওঁর জায়গায় বসতে বললেন। সাধু বসার পর গাড়ী আবার আগের মত চলতে লাগল। সাধুর মাহাত্ম্য কিরকম সবাই তখন বুঝতে পারল এবং আলোচনা করতে লাগল। সাহেব তখন বুঝল—কোন মানুষকে তুচ্ছ জ্ঞান করা উচিত নয়। সাধুর নামটা মা বলেছিলেন, কিন্তু আমার ঠিক মনে পড়ছে না, যতদূর মনে হয় বিজয় গোস্বামী।

* * *

মা বলতেন, "বিশেষ করে দুপুর বেলা কেউ যদি ভিক্ষা করতে আসে, তাহলে তাকে ফেরাতে নেই।"

মা আমাদের এই সম্বন্ধে ছোট বেলায় একটা বেশ চমৎকার গল্প বলেছিলেন—

এক দেশে একটা বুড়ী খেয়ে-দেয়ে তার ঘরে মাটি ও গোবর গোলা নিয়ে মেঝেতে প্রলেপ দিচ্ছে, এমন সময় একজন ভিক্ষুক এসে বলল, "মা আমার জল তেষ্টা পেয়েছে, তা তুমি একটু আমাকে জল দেবে?" বুড়ী বললে, "এখন হবে না।" তখন ভিক্ষুকটি উঠে বললে, "মা আমার ছাতি ফেটে যাচ্ছে, যদি একটু কষ্ট করে দাও, তাহলে বড় ভাল হয়।" তখন বুড়ী রেগে ঐ মাটি ও গোবর গোলা বালতি তাকে দিয়ে বললে যে, "খা"। তখন সেই ভিক্ষুক কষ্ট পেয়ে সেই বাড়ী থেকে চলে গেল। তারপর কিছুদিন বাদে বুড়ী মারা গেল। মারা গিয়ে চাতক পাখী হয়ে জন্মগ্রহণ করলো এবং যেখানেই জল খেতে যায় সেখানেই দেখে, গোবর মাটি মেশানো জল। সেজন্য সে কোন জলই খেতে পারে না। একমাত্র বৃষ্টির জল ছাড়া। সেজন্য সে বৎসরের সব সময়ে জলের অভাবে কষ্ট পায়।

* * *

মা একবার আমাদের এক জাতিস্মরের কথা বলেছিলেন—

একটা মেয়ে এক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছে, তারপর যখন তার বুদ্ধি হয়েছে, তখন সে তার বাড়ীর লোকদের বলেছে যে, "আমার পূর্বজন্মের বাবা মা অমুক দেশে থাকে।" বাবা মা মেয়ের কথানুযায়ী সমস্ত পাড়ার লোককে বললে যে, "আমার মেয়ে এমন বলে।" তখন পাড়ার কতকগুলি বড় বড় লোক এসে বললে যে, "তুমি তোমার বাবা-মাকে চিনে বের করতে পারবে?" মেয়েটি বললে, "নিশ্চয়ই।" তারপর

একদিন তারা সেই দেশে গিয়ে দেখে যে, সেদিন এক প্রকাণ্ড ভোজের আমন্ত্রণ হয়েছে এবং মেয়েটি যাদেরকে বাবা, মা বলেছিল, তাদের শুদ্ধ আরও সমস্ত গ্রামের লোককে এক জায়গায় উপস্থিত করলো এবং সেই মেয়েটিকে তারপর সেই জায়গায় ছেড়ে দিল। মেয়েটি ঠিক তাদের মধ্যে থেকে তার বাবা-মাকে বের করলো এবং নিজেদের বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে বললো যে, সে এখানে রামায়ণ পাঠ করতো এবং আরো যা-যা সেখানে করতো, তা সব বললো। তখন তার বাবা মাও বলল যে, হ্যাঁ— আমার মেয়ে বাড়ীর এইসব জায়গায় এই সবই করতো। সমস্ত লোক এই দেখে অত্যন্ত আশ্চর্য্য হয়ে গেল ; কিন্তু মেয়েটিকে তার মনে থাকার কারণ জিজ্ঞাসা করত সে বলল, যদি সে বলতে আরম্ভ করে, তাহলে সে এইমাত্রই মারা যাবে। এটা মা বলেছিল—সত্যি ঘটনা। তখনকার সংবাদপত্রেও বেরিয়েছিল।

* * *

মা বলতেন, বাবা-মাকে ভক্তি করা প্রত্যেকেরই উচিত। এই সম্বন্ধে মা মোহন আজা নামে এক ভদ্রলোকের মাতৃভক্তির কথা শুনিয়েছিলেন।

মোহন আজা তার মা-কে খুব ভক্তি করতো। মার জন্য শরীর টাকা পয়সা—সব কিছু দিয়েই সেবা করতো। হঠাৎ মায়ের শরীরে এক জায়গায় কি হলো। তখন ডাক্তার বললেন, 'ইনি বৃদ্ধা হয়ে গেছেন বলে, এর চামড়ায় জোড় লাগছে না, একে যদি কেউ চামড়া দেয়, তাহলে বৃদ্ধা সারবে।" তখনই মোহন আজা নিজের গায়ের চামড়া দিলেন এবং তাতেই মা আরোগ্য লাভ করলেন। আবার একবার মায়ের এমন শরীর হলো যে, ডাক্তার বললেন, "যদি কেহ এখন তার গায়ের রক্ত

এনাকে দেয় তাহলে ইনি ভালো হতে পারে।" মোহন আজা বললেন, "আমি দেব।", মোহন আজা নিজের গায়ের রক্ত দিয়ে মাকে বাঁচালেন। এইরকম করে মাকে শরীর ও টাকা দিয়ে অত্যধিক সেবা করতেন।

একদিন মা বললেন, "দেখ বাবা, আমার শ্রাদ্ধ আমি বেঁচে থাকতেই করব, যদি তুই টাকা দিস।" মোহন আজা মায়ের ইচ্ছানুযায়ী যে সব লোককে খাওয়াবার ইচ্ছা, তাদের খাওয়ান এবং ভাল করে শ্রাদ্ধ করতে যা-যা লাগে, সেইসব দিয়েই করলেন। এইরূপ মাতৃভক্তির অনেক গল্প মা আমাদের মাঝে মাঝে শোনাতেন।

* * *

একজন ডাক্তার আমাদের আত্মীয় ছিলেন। তিনি মায়ের প্রসাদ না খেয়ে কোথাও বেরোতেন না কোনদিন।

এক ব্রাহ্মণের বাড়ীতে ঠাকুর আছে। দাদামহাশয় রোজ পূজা করে ও ভোগ দেয়। দাদামহাশয়ের পরিবারের সব মরে গিয়েছে। একমাত্র নাতি ছিল। নাতির বয়স ১০।১১ বৎসর। একবার দাদা-মহাশয় সকাল বেলা বিশেষ এক কাজে বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেলেন, এবং নাতিকে বলে গেলেন যে, তার আসতে সন্ধ্যা হবে, সে যেন ঠাকুরকে খাবার দেয়। দাদামহাশয়ের কথানুযায়ী সে দুপুর বেলা যা রান্না হয়েছে তাই নিয়ে ঠাকুরের কাছে গিয়ে বলল, "ঠাকুর তুমি রোজ দাদুর কাছে খাও, আর আমি তোমায় একদিন খাওয়াতে এসেছি, তাই তুমি খাচ্ছ না। আমি তোমার কাছে কি অপরাধ করেছি? তুমি যদি না খাও, তাহলে দাদু এসে আমায় কত বকবে।" নাতি ভাবছে যে, দাদু ঠাকুরকে রোজ খাইয়ে এসে নিজে খায়। আমাকেও তো আজ তাহলে

তাই করতে হবে। শেষকালে ঠাকুরকে না খেতে দেখে সে বলে উঠল, "তুমি যতক্ষণ না খাবে, আমি ততক্ষণ উঠব না।" তারপর ঠাকুর বেরিয়ে এসে ছেলেকে আদর করে বললেন, "আয়, আমি আর তুই একসঙ্গে খাই।" তারপর তুজনে খেয়ে উঠার পর. ঠাকুর অদৃশ্য হয়ে গেলেন। দাত্ব এসে সমস্ত বৃত্তান্ত শুনে নাতিকে আর আদর করে শেষ করতে পারলেন না। তার নাতি যে ভগবানের দর্শন পেয়েছে।

*　　*　　*

মা একটা ভারি উপদেশের গল্প বলেছিলেন।

এক দেশে এক পরিবারে স্বামী. স্ত্রী, ছেলে, মেয়ে সবাই ছিল। একদিন বাড়ীর কর্তা এক সাধুর কাছে গিয়েছেন এবং সাধুর সঙ্গে আলাপ করেছেন। সাধু তাকে বুড়ো দেখে বললে, "বাবা, তোমার তো সবই আছে ; কিন্তু এখন আর ঐ সব নিয়ে পড়ে থাকলে চলবে না। এখন আমাদের এখানে এসে শেষ কয়েক দিন ভগবানের নাম কর, আর ভাল হতে চেষ্টা করো।"

তখন লোকটি বলল. "আমি না বাড়ীতে থাকলে বাড়ীর লোকের চলে না। আমি বাড়ী ত্যাগ করতে পারব না এব' বাড়ীর দেখাশোনা করে আর ভগবানের নাম করারও সময় হবে না। তখন সাধু বলল, "আচ্ছা তুমি বাড়ী যাও, আমি তোমাকে দেখাব যে তোমার জন্যে কতজনার না চলে, বা তোমার জন্যে ক'জনা সব কিছু ত্যাগ স্বীকার করতে পারে।

বাড়ীতে কর্তা গেলেন, গিয়ে খানিক বাদে বললেন, "আমার শরীর কেমন করছে।" তখন বাড়ীর লোক তার কাছে এসে দেখে—তার আর প্রাণ নেই। তখন বাড়ীতে ভীষণ কান্নার রোল উঠল। বাহিরে থেকে মনে হয় যে, বাড়ীর লোকেদের অসম্ভব রকম কষ্ট হয়েছে।

সকালে যখন কর্তাকে শ্মশানে নিয়ে যাবার বন্দোবস্ত হচ্ছে তখন সেই সাধু তাদের বাড়ীতে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, "এত কান্নাকাটি কেন বাবা?" সবাই তখন ব্যাপারটা বলল, এবং তাই শুনে তিনি বাড়ীর লোকদের বললেন, "আপনাদের দেখছি ভারি কষ্ট হয়েছে।" বাড়ীর লোক সাধু দেখে তার কাছে কর্তার নানারূপ গুণ-গান গাইতে লাগল এবং বলল, "কর্তা মারা যাওয়াতে আমাদের এবার সবাইকে মরতে হবে।"

সাধু সমস্ত কথাবার্তা শোনার পর বললে. "আচ্ছা, আপনাদের কেহ যদি মৃত্যু বরণ করতে পারেন, তাহলে আমি একে বাঁচিয়ে দিতে পারি।" সেই কথা শুনে আর কেহই উত্তর দিল না এবং অনেকেই বলল, "উনি বুড়ো হয়েছেন,.মরবার বয়সেই মরেছেন তার জন্যে আর কি হয়েছে।"

তখন সাধু কর্তাকে বাঁচিয়ে দিলেন এবং বললেন, "দেখলে তো সংসারের ব্যাপার।" কর্তা আর দেরী না করে সাধুর সঙ্গে বেরিয়ে পড়লেন। তখন বাড়ীর লোক তাকে বাধা দিতে আসল ; কিন্তু সে বললে, "সংসার কি, তাহা আমি বুঝেছি। তোমরা আমাকে আর কোন অনুরোধ করো না। আমি আমার কাজে চললাম।" তারপর কর্তা ঈশ্বরের নামে জীবন কাটিয়ে দিল।

* * *

মা বলেছিলেন—এক পরিবারে একমাত্র স্বামী আর স্ত্রী থাকতো। একবার এক বিশেষ কাজে স্বামী একরাত্রের জন্যে বাহিরে গিয়েছিলেন।

স্ত্রী কাজ-টাজ সেরে রাত প্রায় দশটার সময় ভাত খাচ্ছে, এমন সময় স্বামীর মত গলা শুনে বাইরে আসলো এবং দরজা খুলে দিল।

দরজা খুলেই দেখে, স্বামী এসে ঘরে ঢুকল এবং বললে, "আমার খুব ঠাণ্ডা লেগেছে, সেইজন্য সমস্ত ঢেকে-ঢুকে আসলাম, কাজও হল না কিছুই। আমার শরীর ভাল নেই, ওপরে শুতে গেলাম। তুমি খেয়ে এস।"

স্ত্রী খেয়ে-দেয়ে উপরে গিয়ে স্বামীর পা ডলতে বসল, কারণ, তার (স্বামীর) শরীর ভাল নেই। পা ডলতে গিয়েই বুঝতে পেরেছে, এ তার স্বামী নয়। তখন স্ত্রী বলল, "দেখ, আমার জল পিপাসা পেয়েছে, নীচ থেকে জল খেয়ে এখনই আসছি।" স্ত্রী নীচে গিয়ে রাস্তায় চলে এসে, বাহিরের দরজায় শিকল তুলে পাড়ার লোক ডেকে পুলিসের হাতে তুলে দিল।

স্বামী তার পরের দিন এসে সমস্ত বৃত্তান্ত শুনে ভারী খুশি হল এবং স্ত্রীকে অনেক সাধুবাদ করতে লাগল।

বিপদের সময় বুদ্ধি ও সাহস যে ঠিক রাখতে পারে তার বিপদ সহজেই কেটে যায়।

* * *

মা স্বামী-স্ত্রী-র আর একটা গল্প বলেছিলেন —

এক বাড়ীতে এক স্বামী-স্ত্রী বাস করত। স্ত্রী খালিই বলত, "তুমি কোন কাজের না, খালি বসে বসে খাবে।" একদিন জোর করে পাড়ার অন্যান্য লোকের সঙ্গে স্বামীকে বিদেশে পাঠিয়ে দিল। পাঠিয়ে দিয়েই তার খুব দুঃখ হল। তখন ঘরের কোণে বসে বসে স্বামীর কথা ভাবছে। এমন সময় দেখে, তার স্বামী এসে হাজির। স্বামী বলল,

"আমি আর গেলাম না। তোর এখানে থেকে যা কাজ পারি তাই করব।"

কিন্তু স্বামী এধারে পাড়ার লোকের সঙ্গে বিদেশে গিয়ে কাজ-কাম করছে এবং বৎসর খানেক কাজ করে অনেক টাকা করেছে। তারপর বাড়ীর দিকে রওনা দিয়েছে। বাড়ীতে এসে দেখে, স্ত্রী বসে আছে, এবং তাকে দেখে জিজ্ঞাসা করল, "কেমন আছ?" স্ত্রী এই শুনে রেগে উঠে বললে, 'আর ঢং করতে হবে না, ঢের হয়েছে।"

ইতিমধ্যে সেই লোক এসে হাজির। দুই জনার মধ্যে তুমুল ঝগড়া হতে লাগল। তারপর তাদের বাড়ীর সামনে রাখালরা রাজা-রাজা খেলছিল, তারা এসে সমস্ত বৃত্তান্ত শুনল এবং তাদের রাজার কাছে নিয়ে গেল। রাজা দেখলে, লোক দুইটি ঠিক একরকম দেখতে। সে বললে, "দেখ এই যে আমার কাঁচের শিশিটা দেখতে পাচ্ছ, এটার মধ্যে যে ঢুকতে পারবে তারই হবে ঘর।" তখন স্বামী বললে, "মানুষ কি আবার ওর মধ্যে ঢুকতে পারে।" কিন্তু লোকটি ঠিক বলে ওর মধ্যে ঢুকে পড়ল। তখন রাজা তার ছিপিটি আটকিয়ে দিয়ে বলে, "যাও এটা নদীর মধ্যে ফেলে দিয়ে তুমি ঘর সংসার করগে। এ—হচ্ছে ভূত। এ এতদিন তোমাদের বাড়ীতে ছিল।" লোকটি মনের সুখে বাড়ী চলে গেল এবং সুখে স্বচ্ছন্দে ঘর সংসার করতে লাগল।

মার কথার আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে, অবিদ্বান লোকও অনেক সময়ে বিদ্বান লোকের উপযুক্ত বিচার করতে পারে। সামান্য চাষা তার বিচার শক্তি, সাধারণ মানুষের চেয়ে কত বেশী।

*　　　*　　　*

মা আবার ভারি মজার গল্পও মাঝে মাঝে বলতেন। একবার গোপাল ভাঁড়ের গল্প বলেছিলেন,—কৃষ্ণনগরের রাজা কৃষ্ণচন্দ্র গোপাল ভাঁড়কে ডেকে পাঠিয়েছেন। গোপাল ভাঁড় আসতে দেরী হওয়ায় রাজা বললেন, "তোমার এত দেরী হলো কেন গোপাল ?"

গোপাল তার উত্তরে বলল, "রাজা মশাই কি করব, প্রকৃতির ডাক এসে গেল। তাতে সাড়া না দিয়ে আর আসতে পারলাম না।" রাজা সেই শুনে একটু রেগে বললেন, "তোমার প্রাতঃকৃত্য আগে, না রাজার কথা শোনা আগে উচিত ?"

গোপাল ভাঁড় সেই কথা শুনে মনে মনে বললে, "আচ্ছা, তোমায় আমি একদিন জব্দ করব।"

একদিন খুব ভোরে গোপাল এসে রাজাকে বললে, "রাজা, আজকের দিনটা খুব ভাল, গঙ্গায় নৌকা করে একটুখানি বেড়িয়ে আসি।" রাজা তার কথা শুনে চোখ মুখ ধুয়ে চলল।

রাজার সকালে প্রাতঃকৃত্য করার অভ্যাস ছিল.। তাই নৌকার মধ্যে রাজার ভীষণ বেগ এসে গেল। রাজা পাড়ে নৌকা ভেড়াতে বললেন। গোপাল তাই শুনে বলল, "না রাজা মশাই, এখানে সাপের আড্ডা, এখানে বাঘের আড্ডা, ওখানে ডাকাতের আড্ডা, ওখানে ভূতের আড্ডা।" এই রকম নানা কথা বলে, গোপাল ভাঁড় নৌকা ভেড়াতে দিচ্ছিল না। রাজা শেষকালে আর থাকতে না পেরে বললেন, "হোক যত খারাপ জায়গা, আমি এর মধ্যেই প্রাতঃকৃত্য সারব।" শেষকালে নৌকা পাড়ে লাগান হ'ল এবং রাজা প্রাতঃকৃত্য সেরে বললেন, "আমার শরীর অস্থির হয়ে গিয়েছিল। প্রাতঃকৃত্য সেরে এখন শান্ত হলাম।"

গোপাল ভাঁড় তার উত্তরে বলল, "কি রাজামশাই, প্রকৃতির ডাক এলে কি হয় ? আমায় যে ভারি বলেছিলেন।" রাজা সেই কথা শুনে ভারি লজ্জা পেলেন।

* * *

*　　*　　*

গোপাল ভাঁড়ের আর একটা গল্প হলো—এক সময় রাজার সভায় নানারূপ গল্প-সল্প হচ্ছে। এমন সময় রাজা সভার লোকদের বললেন, "দেখ বাবা এমন কোন লোক দেখা যায় না যে বাজার থেকে ইলিশ মাছ হাতে করে আনবে এবং তাকে রাস্তার একজন লোকও তার কত দাম জিজ্ঞাসা করবে না।"

গোপাল ভাঁড় তার উত্তরে বলল, "হ্যাঁ, আমি আনব, কিন্তু কোন লোক তার দাম জিজ্ঞাসা করবে না।" রাজা বললেন, "সেরকম ভাবে তুমি যদি আনতে পার, তাহলে আমি তোমাকে পুরস্কার দেবো।" রাজার সঙ্গে ও অন্যান্য সভার লোকের সঙ্গে কথাবার্তা বলে, গোপাল ভাঁড় বিদায় নিয়ে বাজারে চলে গেল, এবং মাছ কিনে ন্যাংটা হলো, এবং কাপড়টা বগলে করে মাছটা হাতে ঝুলিয়ে ছুটতে ছুটতে রাজার কাছে গেল। রাস্তার লোকে তার মাছের দাম জিজ্ঞাসা করা দূরে থাক. সবাই অন্য দিকে মুখ ঘোরাতে লাগল। রাজা গোপাল ভাঁড়ের কাণ্ড দেখে অবাক হলেন এবং বললেন, "তুমি যেমন করে মাছ নিয়ে এসেছ, কে আবার তোমার দাম জিজ্ঞাসা করবে?"

রাজা বললেন, "গোপাল তোমার সঙ্গে কথায় কেউ পারবে না, বা আমিও পারব না। তোমার পুরস্কৃত টাকা নিয়ে যাও।"

গোপাল তখন কাপড়-চোপড় পরে পুরস্কারের টাকা রাজার কাছ থেকে নিয়ে আনন্দে বাড়ী চলে গেল।

এইরূপ ভাবে মাঝে মাঝে মা আমাদের হাসি-ঠাট্টার গল্প বলতেন ও আমাদের হাসাতেন।

*　　*　　*

* * *

মা বলতেন, আগে-কালের লোক এখনকার লোকের চেয়ে কত সৎ ছিলেন। আগেকার দিনে রেলগাড়ীও ছিল না এবং জাহাজও ছিল না। কেউ যদি কোথায় যেত. এক হেঁটে। না হলে নৌকায়। একবার এক দেশের এক ব্যবসায়ী ব্যবসায় বেরোবে বলে সমস্ত জিনিষপত্র কিনে অন্য দেশে রওনা দিল। পথের মধ্যে প্রকৃতির ডাক এল। তাই নৌকা পাড়ে লাগিয়ে প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে গেল। তার চিরকালই অভ্যাস ছিল যে ঐ কাজে বসে মাটি নখ দিয়ে গর্ত করা। সে যেখানে ঐ কাজ করতে বসেছিল। সেখানেও গর্ত করতে লেগেছে। গর্ত করতে করতে তার হাতে কি যেন একটা বাধে। তখন সে খানিকটা বেশী গর্ত করে দেখে যে সেখানে কয়েক ঘড়া মোহর রয়েছে। সে তাই দেখে তাড়াতাড়ি করে মাটি ঢেকে দিয়ে নৌকায় গিয়ে হাজির হল এবং বলল, "শীঘ্র নৌকা চালাও।" নৌকার লোকেরা কি হয়েছে জিজ্ঞাসা করলে সে বলল, 'আগে নৌকা চালাও পরে বলবখন।" নৌকা যখন অনেক দূর চলে গেছে তখন সে সমস্ত বৃত্তান্ত খুলে বলল, এবং আরও বলল. "কার জিনিষ কে জানে আমার নিয়ে কি দরকার?' সে বলল, ' আমি ভাবলাম আমার ওখানে বেশীক্ষণ থাকলে লোভ ক্রমেই বেড়ে যেত এবং নিতে হত। সেজন্য আমি চলে আসলাম তাড়াতাড়ি।"

মা বলতেন আগেকার দিনে লোকেরা এমনভাবে বাড়ীতে টাকা রেখে দিতেন—যাতে তার বংশের লোকেরাই ভবিষ্যতে পায়।

* * *

• • •

এক গ্রামে অনেক টাকা নিয়ে রাত্রিবেলা ভূতেরা খেলা করছিল। খেলা করতে করতে টাকার সব গণ্ডগোল হয়ে যাওয়াতে ভীষণ ঝগড়া চলছিল। এমন সময় গ্রামের ময়রা কাজ শেষ করে বাড়ী ফিরছিল, তাকে দেখে ভূতেরা বলল, "তুমি আমাদের টাকা ভাগ করে দাও।" সে তখন একটু ভেবেই বলল, "দেখ এখন রাত হয়ে গেছে, কাল আমি তোমাদের টাকা ভাগ করে দেব।" এই বলে সে টাকা নিয়ে বাড়ী চলে গেল এবং সারা রাত ভাবল, আমি কার কত টাকা কি জানি, শেষকালে এই নিয়ে আবার আমাকে মেরে ফেলবে। তাই ঠিক করল, সকালে উঠেই সে গয়ায় রওনা হবে এবং গয়ায় গিয়ে পিণ্ডি দিয়ে আসবে। সকালে উঠেই সে গয়ার দিকে রওনা হ'ল। পথিমধ্যে তারা আবার তাকে ধরেছে এবং বলল, "কোথায় যাচ্ছ?" সে তখন সমস্ত কথা খুলে বলল, এবং আরও বলল, "তোমরা এত কষ্ট পাচ্ছ তোমাদের কষ্ট থেকে মুক্ত করে দিই।" তারপর তারা রাজি হল এবং গয়ায় লোকটি তাদের পিণ্ডি দিয়ে উদ্ধার করে দিল এবং তারাও ময়রাকে কত আশীর্ব্বাদ করল। ময়রা সেই টাকা দিয়ে গ্রামে ভাল পুকুর কেটে দিল। মন্দির করে দিল, রাস্তাঘাট তৈরী করে দিল। এই রকম করে করে সমস্ত টাকা দিয়ে গ্রামের লোকে যাতে সুখে স্বচ্ছন্দে থাকতে পারে তার ভালভাবে বন্দোবস্ত করে দিল।

* * *

*　　　　*

আমি যখন খুব ছোট ছিলাম, তখন মা আমায় শেয়াল পণ্ডিতের গল্প বলেছিলেন।

একদিন এক শেয়াল রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে দেখে, ক'টা বই পড়ে রয়েছে ; তার মধ্যে সে একটা বই তুলে নেয় এবং নদীর ধারে গিয়ে পড়তে থাকে।

এমন সময় একটা কুমীর তাকে দেখতে পায় এবং তার কাছে এসে বলে "তুমি তো ভারী পণ্ডিত। তুমি আমার ৭টি ছোট ছোট ছেলেকে পড়িয়ে মানুষ করে দিতে পার ?" শেয়াল সেই শুনে বললে. "নিশ্চয়ই ৭ দিনে আমি তোমার ছেলেকে পণ্ডিত করে দেবো।" তারপর কুমীর ৭টি ছেলেকে শেয়ালের হাতে দিল এবং তার বাড়ী দেখে আসল। তারপর রোজই কুমীর শেয়ালের বাড়ী যায়। শেয়াল রোজ সকালে উঠেই একটা একটা করে কুমীরের বাচ্চা খায়। আর যখন কুমীর তার কাছে ছেলে দেখতে আসে তখন একটা বাচ্চাকেই জলথেকে একবার একবার করে ৭ বার তুলে দেখায় আর বলে. "এই তো বিদ্বান হয়ে গেল। আমি ৭ দিন পরে সকলকে বিদ্বান করে তোমার কাছে সবাইকে দিয়ে দেব।" নির্দিষ্ট দিনে কুমীর ৭টিকে খেয়ে ফেলল, এবং বাড়ীর থেকে তারপর পালিয়ে গেল। কুমীর এসে দ্বার থেকে শেয়াল পণ্ডিতকে ডাকে, কিন্তু শেয়াল পণ্ডিত আর আসে না। তারপর কুমীর বাড়ীর মধ্যে গিয়ে দেখে শেয়ালও নেই, তার বাচ্চারাও নেই—আছে খালি রক্ত আর কতগুলো হাড়। তখন তার ভারী রাগ হ'ল, সে মনে মনে বলল, "আচ্ছা আমিও তোমায় দেখে নেব। যেদিন তুমি এই নদীতে জল খেতে নামবে, সেদিন আমিও তোমাকে আর ছাড়ব না।

তারপর এক শেয়ালের খুব জল পিপাসা পেয়েছে এবং সেই কারণে সে নদীতে জল খেতে নেমেছে। কুমীরও তাকে দেখেই পা কামড়িয়ে ধরেছে। এমন সময় একটা বাঁশ জল দিয়ে ভেসে যাচ্ছিল।

তাই দেখে শেয়াল বাঁশটি নিয়ে জলের মধ্যে খাড়া করে ধরল এবং বলল, "কুমীর আমার পা না ধরে লাঠি ধরেছ।"

কুমীর ভাবল সত্যিই তাই হয়ত হবে। সে তাড়াতাড়ি করে পা ছেড়ে লাঠি ধরল আর শেয়াল সেইমাত্র পাড়ে উঠে "কুমীরকে ঠকিয়েছি" বলতে বলতে চলে গেল। কুমীরের তাই দেখে ভারি মনে রাগ হ'ল ও মনের দুঃখে জলের গভীরে চলে গেল।

* * *

মা বলতেন, বিপদের সময় যে সাহসী থাকতে পাবে ও হতবুদ্ধি হয় না তার বিপদ আসলেও কিছুই করতে পারে না।

একবার এক মহিলা, নদীতে স্নান করতে গিয়েছে। স্নান করবার সময় কুমীর এসে তাকে মুখে কবে তার গর্ত্তে নিয়ে গেল।

মহিলাটি চিন্তা কবছে কি করে এই কুমীরের হাত থেকে বাঁচা যায়। হঠাৎ তার মাথায় বুদ্ধি খেলল। যেমনি একটু সুবিধা পেয়েছে, তেমনি নিজের আঙ্গুল কুমীরের চোখের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছে এবং সেই মাত্র কুমীব অন্ধ হয়ে গেল। শেষে যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে কুমীর জলেব মধ্যে নেমে গেল। তারপর মেয়েটি দেখে কুমীরেব বাড়ীব ভিতরে রক্ত হাড় আর অনেক গহনা রয়েছে।

মহিলাটি তখন বুঝল যে যত সব মানুষ খেয়েছে তাদেরই সমস্ত গহনাপত্র ও হাড রক্ত। সে সেখান থেকে সমস্ত গহনাপত্র বাড়ী নিয়ে গেল এবং বাড়ীতে এসে ঐ সমস্ত গহনাপত্র—ভাল কাজে ব্যবহার করল। এইরূপে মহিলাটি রক্ষা পেল।

মা—আমাদের প্রায়ই হনুমানের কথা বলতেন। একবার এক প্রকাণ্ড ভোজ হয়। সীতার উপর রান্নার ভার পড়ে। সীতা সারাদিন রাঁধে ও সকলের পরিবেশন করে।

শেষকালে হনুমান খেতে আসে এবং হনুমান বলে, আমি যদি সত্যিই রামের ভক্ত হয়ে থাকি তা'হলে আমায় কেউ খাইয়ে পেট ভরাতে পারবে না।

হনুমান যত কলাগাছ ছিল সব কটা থেকে কলার পাতা নিয়ে এসে বসল এবং সীতা স্বয়ং এসে হাঁড়ি থেকে ভাত দিয়ে যাচ্ছিলেন। ভাত দিয়ে যখন তরকারি আনতে যাচ্ছিলেন এবং তরকারি এনেই দেখেন যে হনুমানের পাতে আর ভাত নেই। আবার তরকারি দিয়ে ভাত এনে দেখেন আর পাতে তরকারি নেই। এইরূপ ভাবে সীতা যে কত যাওয়া-আসা করলেন তার ঠিক নেই।

শেষকালে সীতা ক্লান্ত হয়ে ধ্যানে বসলেন এবং বুঝলেন যে, হনুমান মনে মনে ঠিক করেছে, আমি যদি রামের ভক্ত হই তা'হলে আমায় কেউ পেট ভরাতে পারবে না।

সীতা তখন হনুমানের কাছে গিয়ে হনুমানের মাথার উপর ভাত দিয়ে বললেন, 'হনুমান তোর মাথা দিয়ে ভাত বেরিয়ে পড়েছে, শীঘ্রই উঠে পড়।" তখন হনুমান তাড়াতাড়ি করে উঠে পড়ল।

* * *

মা আমাদের বলেছিলেন যে, যেখানে রাম নাম হয়, সেখানে হনুমান ছদ্মবেশে এসে হাজির হয় এবং রামনাম শোনে ও করে।

একবার কোন এক দেশে কিছুদিন রামনাম হয়েছিল। লোকে রামনাম করতো, আর দেখতো একজন থুর-থুরে বুড়ো, কিন্তু চমৎকার শরীর, তার মুখে রামনামের সুর। সে তাদের সঙ্গে রোজ রোজ রামনাম করতো।

শেষের দিন ঐরূপ রামনাম করতে করতে নিজের রূপ ধরল এবং সঙ্গে সঙ্গে অদৃশ্য হয়ে গেল।

* * *

মা রামকৃষ্ণদেবের শিষ্য নাগ মহাশয়ের অনেক কথা জানতেন। মা নাগ মহাশয়ের কিছু কথা আমাদের শুনিয়েছিলেন।

নাগ মহাশয় ছিলেন হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার। তাঁর বাবার অবস্থা তেমন ভাল ছিল না। বাবা তাই আশা করতেন যে ছেলে আমার কত টাকা রোজগার করে আনবে। কিন্তু ছেলেও হলো সেরকম; রোগী দেখে আসে কিন্তু টাকা নেয় না এবং যদি গরীব লোক হয় তাহলে এমনকি ঔষধের দামও নেয় না। আবার হয়তো এক রোগীর বাড়ী গিয়ে দেখলেন যে রোগী জ্বরে কাঁপছে অথচ পয়সা নেই যে কোন কিছু কিনে তার গায়ে দেয়। তখন নাগ মহাশয় নিজের জিনিষ তাকে দিয়ে আসেন। বাবা একবার নাগ মহাশয়ের ডাক্তারের পোষাক কিনে ছিলেন, কিন্তু সে সব নাগ মহাশয় ব্যবহার করলেন না। আবার নাগ মহাশয় এক ধনী লোকের বাড়ীতে রোগীর চিকিৎসা করে ভাল করলেন এবং তখন সেই বাড়ীর কর্তা একটা বাক্স করে কতকগুলি টাকা দিতে গেলেন কিন্তু সেটা নিলেন না; যা প্রাপ্য তাই শেষ কালে

নিলেন। শেষে সেই বাড়ীর কর্তা নাগ মহাশয়ের বাবার হাতে সেই উপহার দিয়ে বললেন, "আপনার ছেলে কিছুতেই প্রাপ্যের এক পয়সাও বেশী নিলেন না।"

একবার নাগ মহাশয় কোন এক স্নান যাত্রার সময়ে কলকাতা থেকে তাদের দেশে আসলেন। বাবা তাই দেখে ছেলেকে বললেন, "তোর কি রকম আক্কেল রে! স্নান করে আয়. না আগেই চলে আসলি।" তাই শুনে নাগ মহাশয়ের মনে ভারি কষ্ট হলো। "হায়রে আমি কি করলাম।"

যেদিন স্নানযাত্রা লাগবে ঠিক সেই সময় নাগ মহাশয়ের বাড়ীর লোকেরা দেখতে আরম্ভ করে যে উঠানে গঙ্গার মত জল উঠতে আরম্ভ করেছে। বাড়ীর লোকে তাই দেখে অবাক হয়ে গেল এবং পাড়া প্রতিবেশীদের জানিয়ে দিল যে গঙ্গা আমাদের বাড়ীতে এসেছে। সবাই স্নান করতে এস। কত দূর-দূর থেকে সব লোকেরা স্নান করতে আসল। নাগ মহাশয় ও নাগ মহাশয়ের বাড়ীর লোকেরা সেই জলে স্নান করলেন, তারপর ঠিক যোগ যাওয়ার সময় সেই জল উঠান থেকে দূর দূর করে নেমে কোথায় চলে গেল।

মা বলেছিলেন, নাগ মহাশয়ের এমন ভক্তি যে মা গঙ্গা তাঁর বাড়ীতে এসেছিলেন।

* * *

মা ভূপতি মহারাজের কিছু কথা আমাদের বলেছিলেন।

ভূপতি মহারাজ আমাদের বাড়ীতে প্রায়ই আসতেন। তাঁর কাপড়

খুব তাড়াতাড়ি নোংরা হয়ে যেত কারণ তিনি যেখানে সেখানে বসেই ঠাকুরের নাম করতেন। কিন্তু কাপড় নোংরা হয়ে যাওয়ার দিকে তাঁর কোন লক্ষ্যই ছিল না।

তিনি আমাদের বাড়ী আসলে, বাবা একটা কাপড় দিলেন ; তিনি সেটা পরতেন আর মা তাঁর কাপড়টা সাবান দিয়ে পরিষ্কার করে দিতেন, কাপড় শুকালে তিনি আবার সেই কাপড় পরে চলে যেতেন। তিনি এতই সরল ছিলেন যে, রোজ ঠাণ্ডা ভাত খেয়ে ভাবতেন যে ভাত কি গরম হয় না? তাই তিনি তখনই মাকে জিজ্ঞাসা করে ফেললেন, "মা ভাত কি গরম হয় না?" মার মন তো, মা আর ছেলেকে কি বলে বোঝাবে। মা তখন বলতে বাধ্য হলেন। "হ্যাঁ বাবা।"

তিনি ছিলেন এত সরল যে মলত্যাগ করে ছুটে এসে বলতেন, "দেখতো গুরুদাস, আমার পেছনে কিছু লেগে আছে কিনা?" তারপর হয়তো কেউ দেখে বললে, "না নেই।" তখন তিনি ঘরের মধ্যে গিয়ে বসতেন। এই রকম তাঁর বাল্যকালে স্বভাব ছিল।

একবার বাড়ীর কার যেন খুব অসুখ করেছিল। তখন বাড়ীর লোকেরা এসে তাঁকে ধরল যে তিনি (ভূপতি মহারাজ) থাকতে একজন বাড়ীর লোক মরে যাবে। তাঁকে বাঁচাতেই হবে।

তাঁর তো কোন দিকেই ভ্রূক্ষেপ ছিল না ; খালি ভগবানের নাম। তারপর বাড়ীর রোগী আস্তে আস্তে ভাল হয়ে গেল।

একবার আমাদের বাবার ভয়ানক কোষ্ঠকাঠিন্য হয়েছিল। অস্বস্তিতে বাবা চারিদিকে ছুটে বেড়াচ্ছেন। এমন সময় বাবা এক-জনকে দিয়ে ভূপতি মহারাজকে ডেকে আনালেন এবং ভূপতি মহারাজ এসে চেয়ারের উপর বসে যেমন সব সময় জপ করেন, তেমন করতে লাগলেন। এধারে ডাক্তারও বাবার এইরকম দেখে বলেছেন যে, এর এমন অবস্থা যে পিচকিরি দেওয়া যাবে না।

বাবা এধারে ঘরের মধ্যে ছটফট করছেন, আর মহারাজ মহারাজ

বলে চেচাঁচ্ছেন। এমন সময়ে বাবা মলত্যাগ করতে সমর্থ হলেন এবং বাবা সুস্থ হলেন ও বললেন, "মহারাজ বাঁচলাম।"

মহারাজের এত দয়া যে সবাইকে দয়া করতে সমস্ত সময়ে প্রস্তুত হয়ে থাকতেন।

* * *

মা বলতেন, পুরীর জগন্নাথ দেবের প্রসাদের মাহাত্ম্য যেমন, তেমনি পুরীর সমুদ্রেরও মাহাত্ম্য কম নয়।

যদি কেউ পুরীর সমুদ্রের কাছ দিয়ে যেতে যেতে বলে, "সমুদ্র আমার কাছে আসতে পারে না—তখনই সমুদ্রের ঢেউ এসে তাকে ভিজিয়ে দিয়ে চলে যায়।"

পুরীর প্রসাদ সবাই মিলেমিশে একসাথে খেতে পারে। সেখানে কোন রকম জাতিভেদ নেই।

মা বলেছিলেন যে একবার, একজন ব্রাহ্মণ খুব জাত-পাত মানতেন, তিনি নিজের বাড়ীর লোকের হাতের জিনিষ ছাড়া রাস্তায় কোন জিনিষ খেতেন না। এমন কি যে কোন মন্দিরেরও প্রসাদ যখন-তখন গ্রহণ করতেন না। তিনি ছিলেন খুব পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন। তিনি নিজেকে মনে করতেন সাচ্চা ব্রাহ্মণ। তিনি রোজ সকালে গঙ্গায় স্নান করতেন, তারপর মহাদেবের পূজা করে প্রসাদ গ্রহণ করে জল খেতেন।

তিনি হঠাৎ ছুটিতে পুরী বেড়াতে যাবেন ঠিক করলেন। এবং যথারীতি পুরী পৌঁছলেন। তাঁর প্রতিদিনে অভ্যাসের মত স্নান করতে বেন কিন্তু পুরীতে সমুদ্র ছাড়া কোথায় স্নান করবেন। তিনি তাই

সমুদ্রে স্নান করলেন। স্নান করে জগন্নাথ দেবের মন্দিরে পূজা দিলেন, তারপর প্রসাদ গ্রহণের পালা। তিনি প্রসাদ নিতে গিয়ে দেখলেন ব্রাহ্মণ ছাড়া অন্য জাতের লোকের কাছ থেকে প্রসাদ গ্রহণ করতে হবে। তিনি অন্য জাতের লোকের কাছ থেকে প্রসাদ খেতে ঘৃণা বোধ করলেন, এবং প্রসাদ খেলেন না।

তার পরদিন সকালে উঠেই দেখে তার শরীরে কয়েকটি ঘা-এর মত দেখা গেল। তখন তিনি ডাক্তার দেখালেন, ডাক্তার বললেন "এই ঘা কুষ্ঠ রোগ। এই রোগীদের আলাদা করে রাখতে হয়। সকলের সাথে একসাথে রাখতে নেই।" তখন ব্রাহ্মণ খুব চিন্তায় পড়ে গেল এবং ঠাকুরের নাম করতে লাগল। তখন স্বপ্ন দেখল, ঠাকুর বলছেন," তুই যাকে ঘৃণা করেছিস যার হাত থেকে প্রসাদ নিতে গিয়ে প্রসাদ গ্রহণ করিসান. এখন তুই যদি ওর এঁটো প্রসাদ খাস, তাহলে তোর এই রোগ সেরে যাবে।

তার পরের দিন সে উঠে দেখে সত্যিই তার সমস্ত দেহে এ রোগ হয়েছে ; সে যেই মাত্র তার কাছে গিয়ে প্রসাদ খায় এবং তার রোগ ভাল হয়ে যায়।

* *

মা আমাদের একবার চাঁদ ও সূর্যের একটা গল্প বলেছিলেন, একবার চাঁদ আর সূর্য এরা নিমন্ত্রণ খেতে যাচ্ছিল। এমন সময় তাদের মা বললে, "দেখ আমার জন্য তোরা কিছু কিছু করে নিয়ে আসিস, তারা সেই কথা শুনে বলল "আচ্ছা।" এধারে নিমন্ত্রণ খাবার সময় আর সূর্যের

মায়ের কথা মনে নেই। সেইজন্য সে আর কিছুই নেয়নি। এধারে চাঁদের মায়ের কথা ঠিক মনে ছিল। এবং সে যা খেয়েছে তার কিছু কিছু আঙ্গুলে করে নিয়েছে। তারপর নিমন্ত্রণ খেয়ে যখন দুইজনে বাড়ী ফিরল ; তখন মা জিজ্ঞাসা করলেন "তোরা আমার জন্য কী এনেছিস ?" সূর্য সেই কথা শোনা মাত্র বলল, "মা আমি ভুলে গেছি।" আর চাঁদ কেনী আঙ্গুলে করে যা যা খাবার এনেছিল মাকে তা দিল। মা তখন চাঁদকে বলল, "তুই রাত্তিরে আলো দিবি, এবং সেই আলোতে লোকে আনন্দ পাবে। আর সূর্যের কাজ দিনের বেলায় আলো দেওয়া। এবং তার তেজ কেহ সহ্য করতে পারবে না।"

*   *   *

মা আমাদের বলেছিলেন যে দশরথের পিণ্ডি দেবার জন্য রাম সমস্ত কিছু সংগ্রহ করতে গেছেন, এমন সময় দশরথ সীতার কাছে এসে বললেন, "তুমিই আমার পিণ্ডি দাও।" সীতা তাতে বললেন, "বাবা আমার কাছে আপনাকে পিণ্ডি দেবার মতো কিছুই নেই। আপনার দুই ছেলে আসুক তারপর আপনাকে পিণ্ডি দিচ্ছি।" দশরথ তা না শুনে নদীর বালু দিয়ে দিতে বললেন। সীতা তাই দিয়ে তাঁকে পিণ্ডি দিলেন এবং তার সাক্ষী একজন ব্রাহ্মণকে, তুলসী গাছকে, সরজু নদীকে, অশ্বত্থ গাছকে আর বটগাছকে রাখলেন। রাম ফিরে আসলে সীতা সমস্ত বৃত্তান্ত বললেন, তাতে রাম বিশ্বাস করলেন না। এবং বললেন, "তোমার কোন সাক্ষি আছে ?" সীতা তখন বললেন, "হ্যাঁ" এবং তাদের সবাইয়ের কাছে নিয়ে গেলেন। তারপর প্রথমে ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করলেন,

তখন ব্রাহ্মণ তার চৈতন নেড়ে বলে দিলেন, "কই নাতো আমি দেখিনি।" তখন সীতা রাগে ব্রাহ্মণকে অভিশাপ দিলেন, "তোকে চির-কাল কাজ করে খেতে হবে। তোর হাঁ হাঁ কোনদিন মিটবে না। একে একে সবাইকে জিজ্ঞাসা করতে সকলে না বললে শুধুমাত্র বটগাছ ছাড়া। বটগাছ বলল, "হ্যাঁ আমি দেখেছি সীতা শ্বশুরকে পিণ্ডি দান করেছে।" তখন সীতা বটগাছকে বর দিলেন যে শীতকালে গরম থাকবি, আর গরমকালে ঠাণ্ডা থাকবি। আর তোর পাতা কোনদিন একসঙ্গে ঝরে পড়বে না। একটি একটি করে পড়বে আবার নূতন পাতা হবে। তোর তলায় লোকে বসে আনন্দ পাবে। আর তুলসী গাছ না বলাতে তাঁকে অভিশাপ দিলেন যে তোর পাতা ছাড়া বিষ্ণুর পূজা হবে না, ঠিকই কিন্তু তুই যেখানে সেখানে জন্ম নিবি, আর তোর মাথায় কুকুর দেখলেই প্রস্রাব করবে। সরজু নদী না বলাতে সীতা অভিশাপ দিলেন যে "তোর জল থাকবে না মাটির নীচে সব সময় কুলকুল করে বহে যাবি। খুঁড়ে তোর জল বের করতে হবে।" আর অশ্বত্থ গাছ না বলাতে তাকে অভিশাপ দিলেন যে, তোর পাতা সব একসঙ্গে ঝরে পড়বে। বসন্তকালে তোকে লোকের শুকনো মনে হবে। আর সব সময় তোর খন খন করে শব্দ হবে। এই শব্দ লোকে পছন্দ করবে না।

*   *   *

এক গ্রামে এক ধনী লোকের বাস ছিল। তার পরিবারে একমাত্র ছেলে ও ছেলের বৌ ছিল। তাদের ২।৩ বৎসরের একটি নাতিও ছিল। ছেলে বিদেশে কাজ করে, মাঝে মাঝে আসে।

কর্তা বাড়ীর সামনে এক পুকুর কাটিয়েছিল কিন্তু জল আর

আসে না। তখন পাড়ার কোন এক লোক বলল, "তোমার নাতিকে গলা কেটে ফেলে তার রক্ত দিয়ে পূজা করা হোক, তাহলে পুকুরে জল আসবে।"

কর্তা আর পাড়ার লোকদের পুকুর নিয়ে নিন্দা সহ্য না করতে পেরে, তাই ঠিক করল।

বৌমাকে বলল যে, "পুকুরে আজ পূজা করে জল আনা হবে; সেজন্য পাড়া প্রতিবেশীদের সবাইকে খাওয়াতে হবে। তাই তোমাকে আজ সারাদিন রান্না করতে হবে।" বৌমা রাজি হল এবং ছেলেকে বাবার কাছে দিয়ে রাঁধতে গেল।

এধারে ছেলে নিয়ে দাদু যা করবার কথা ছিল, তাই করল এবং পুকুরেও জল আসল। সন্ধ্যাবেলা সমস্ত রান্না করে বৌমা পুকুরে স্নান করতে গেল। এ ধারে শ্বশুর-শাশুড়ী ভয়ে ঘরের দরজা-জানলা বন্ধ করে রয়েছে। বৌমার স্নান করতে গিয়ে মনে হয়েছে যে আমার আজ পূজো, তা কাজ করতে করতে পূজার কথা আমার মনে নেই। সেই পূজা যারা করে তারা চাক করে খায় এবং সারাদিন উপোস করে। তাই তার ভারি দুঃখ হলো এবং মনে মনে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করে ক্ষমা চাইল। সারাদিন তার উপোস ছিল। তখন সে পুকুরের বালু দিয়ে চাক করে খেয়ে নিল এবং তারপর বাড়ীর দিকে রওনা হলো। এমন সময় দেখে. ছেলে কাঁদতে কাঁদতে মার পিছু পিছু আসছে। তখনই মা ছেলেকে কোলে করে নিয়ে বলল, "দেখ বাবা-মায়ের কেমন আক্কেল, আমার ছেলেকে এখানে ফেলে রেখেই কোথায় চলে গিয়েছে।"

বাড়ীতে গিয়ে মা-মা করে ডাকছে, মা-বাবা আর দরজা খোলে না — আর সাড়াও দেয় না। তখন নিজে নিজে চেঁচিয়ে বললে "মা তোমরা কেমন গো আমার ছেলেকে ঘোর সন্ধ্যাবেলা পুকুরের ধারে ছেড়ে চলে এসেছ। যদি আমার ছেলে জলে ডুবে যেত।" এই কথা

শোনামাত্র শ্বশুর-শাশুড়ী তাড়াতাড়ি করে দরজা খুলে বেরিয়ে এল এবং নাতিকে কোলে করে কত আদর করতে লাগল আর সমস্ত ঘটনাটা খুলে বলল।

মা তাই আমাদের বলতেন, ভগবানকে যারা ঠিক ভক্তি করে বা ডাকে তাদের ভগবান নানা বিপদ থেকে মুক্ত করেন।

* * *

মা আর একটা কথা আমাদের বলে ছিলেন। একজন মেয়ে ছোট বেলায় একটা কেঁচোকে অর্ধেক করে কেটে ফেলেছিল। কিন্তু কেঁচোটা মরে নি। মেয়েটির তার পর বিয়ে হয়ে ছেলে হয়, কিন্তু ছেলেকে মেঝের উপর রেখে স্নান করতে যেত এবং এসে দেখত ছেলে মরে পড়ে রয়েছে। এই রকম করে তার দুই তিনটা ছেলে মরে গেল। তার পর ছেলে হলে সে তার শাশুড়ীকে বসিয়ে রেখে স্নান করতে গেল। শাশুড়ী বসে আছে। দেখে একটা কেঁচো ছেলের বিছানায় এসে হাজির। তাই দেখা মাত্র শাশুড়ী কেঁচোটিকে সঙ্গে সঙ্গে মেরে ফেলে। তার পর ছেলেটিও থাকল। স্নান করে এসে মা দেখে মরা কেঁচোটি। তখন তার ছোট বেলাকার কথা মনে পড়ে যায়। তখন সে সমস্ত বৃত্তান্ত খুলে বাড়ীর লোকেদের বলল। তারপর আর মেয়েটির কোন ছেলে মারা যায় নি। তাই মা আমাদের বলতেন, কোন জীব জন্তুকে এই রকম করে আধ মারা করে রাখা উচিত নয়। না মারার চেষ্টাই করতে হয়। আর যদি একান্ত মারার প্রয়োজন তাহলে সমূলে শেষ করা উচিত।

* * *

আমরা মহা-নিৰ্ব্বাণ মঠের কথা মা'কে বলতে মা বলেছিলেন, ঐ সাধুর খুব ভক্তি ছিল এবং অসাধারণ শক্তিশালী ছিল। খালি ভগবানের নামে কাটিয়ে দিতেন। একবার গভর্ণমেণ্ট ইলেকট্রিকের তার শরীরের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দেয়; কিন্তু তাতেও তার কিছুই হয় না। কেবল যে খানটা দেয় সেই খানটা গর্ত হয়ে যায়।

মা বলতেন আমাদের দেশতো আমলায়। আগে মায়েরা সবাই আমলায় থাকতেন। অবশ্য মার বিয়ের আগেই বাবারা কোলকাতায় থাকতে আরম্ভ করে। আগেকার দিনে ডাকাতরা ডাকাতির আগে বাড়ীতে চিঠি দিত। এবং মশাল নিয়ে ডাকাতি করতো। একবার আমলার বাড়ীতে এইরকম ডাকাত পড়ে। তখন বাড়ীর বাহিরে এক পাগলী থাকত। সে আমাদের বাড়ীতেই খেত। কিন্তু থাকত বাহিরেই, ডাকাত তাকে পাগল দেখে আর কিছু বলেনি এবং ডাকাত জিনিসপত্র নিয়ে যখন চলে যাচ্ছিল তখন পাগলিটিও তাদের সঙ্গে পাগলামি করতে করতে চলল। ডাকাতদের যেতে যেতে সকাল হয়ে যাওয়াতে নদীর ধারে বালুতে গর্ত করে সেখানে সমস্ত কিছু রেখে বলল. কাল এসে নিয়ে যাব। ডাকাতরা চলে যাওয়ার পর বাড়ীতে সকলে কাঁদছে। তখন পাগলীটি এসে তাদের বলল, "তোমাদের কোন ভয় নেই, আমি তোমাদের সব জিনিস পাইয়ে দিব।" এই বলে সে সেখানে বাড়ীর লোকদের নিয়ে গেল এবং গর্ত খুলতে বলল। তারপর সমস্ত জিনিস পেয়ে আর তাদের আনন্দ ধরে না এবং পাগলীটি যাতে ভাল করে সারাজীবন থাকতে পারে বা খেতে পারে তার বন্দোবস্ত বাড়ীর লোকেরা করে দিল।

মা আমাদের অনেক সময়ে অনেক ভাল ভাল কথা বলতেন। যাতে ভগবানের উপর আমাদের ভক্তি বাড়ে। মা আমায় একবার বলেছিলেন যে এক গরীবের বাড়ীতে এক ছোট ছেলে আর তার মা বাস করতো। বাবা মারা গিয়েছিল। ছেলেটি যাতে পড়াশুনা শিখে তার জন্য পাঠশালায় ভর্তি করে দিয়েছিল। কিন্তু বাড়ী আসতে আসতে ছেলের সন্ধ্যা হয়ে যেত। একদিন ছেলেটি বলল, মা আমার আসতে আসতে সন্ধ্যা হয়ে যায়। সেই জন্য ভয় করে। মা ভাবল, আমার আবার দ্বিতীয় লোক কোথায় ? তাই ছেলেকে এই বলে বুঝাল, "বাবা, তোমার মধুসূদন দাদা বনে থাকে, যদি তোমার যেতে যেতে ভয় করে তা' হলে মধুসূদন দাদাকে ডেকো।" ছেলেটি ভাবল, সত্যিই বোধহয় আমার মধুসূদন দাদা বনে থাকে। তাই জন্যে সে যখন পাঠশালায় যেত তখন ডাকতএবং ফিরবার সময়ও ডাকত। ডাকামাত্র একজন সুপুরুষ ছেলে বন থেকে বেরিয়ে আসত এবং ভাই বলে গলা জড়িয়ে ধরতো ও কতো আদর করে পাঠশালার কাছে পেঁাছে দিয়ে যেত। আবার ফিরবার সময়েও বাড়ীর কাছ পর্যন্ত পোঁছে দিয়ে যেত। গুরুমহাশয়ের মা মারা যাওয়াতে সমস্ত ছাত্রের কাছ থেকে গুরুমহাশয় সাহায্য চাইলেন এবং অনেকে অনেক কিছু দিল। তাই ছেলেটি মা'র কাছে গিয়ে গুরু মহাশয়ের কথা বলল। মা তার উত্তরে বলল, "দেখ আমরা গরীব, তা তুমি তোমার মধুসূদন দাদার কাছে চেও।"

তারপরের দিন সে মধুসূদন দাদার কাছে গিয়ে সমস্ত বৃতান্ত বলেছে এবং মধুসূদন দাদা তাতে বলেছে, তুমি গুরুমহাশয়কে বলো,—"আমি যত দই লাগে তত দই দেব।" সে গিয়ে গুরুমহাশয়কে বলেছে।

নির্দিষ্ট দিনে ছেলেটিকে মধুসূদন এক ভাঁড় দই দিয়েছে এবং এটি নিয়ে ছেলেটি গুরুমহাশয়কে দিয়েছে। মাত্র অতটুকু দই দেখে গুরুমহাশয় রেগে গেছে এবং রাগ ছেলেটিকে ধরে এত মারলেন যে, ছেলেটি অজ্ঞান হয়ে পড়ল। তারপর অন্য লোককে বললেন, "যাও এই সামান্য দই অন্য

এক পাত্রে ঢেলে রাখগে।" লোকটি দই যতই ঢালে ততই পড়ে, শেষ আর হয় না। তখন এই দেখে গুরুমহাশয় ছেলেটির কাছে গিয়ে জল দিয়ে জ্ঞান ফেরালেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন, "তুই এই দই কোথা থেকে কার কাছে পেয়েছিস? তাকে আমায় দেখাতে পারিস?" এই বলে গুরুমহাশয় তখন তাকে খুব আদর করতে লাগলেন। ছেলেটি তখন সমস্ত বৃত্তান্ত বলল, এবং গুরুমহাশয় তাকে বললেন, "আমাকে তার কাছে নিয়ে চল।" এ'বারে যে সব লোক খেতে এসেছে তাদের দই খেতে এত ভাল লেগেছে, খালি দই-ই পেট ভরে খেয়ে বাড়ী চলে যেতে লাগল।

তারপর গুরু মহাশয় ছেলেটির সঙ্গে বনে গেলেন এবং গিয়ে ছেলেটি মধুসূদন দা বলে ডাকতে আরম্ভ করল; তখন একটা কথা ভেসে আসলো—"তোর গুরুমহাশয় আমাকে দেখবার মত পূণ্য করেনি। তোর বাড়ী যাওয়ার সময় আবার আমি আসব।"

গুরুমহাশয় সেই কথা শুনে ছেলেটিকে অত্যন্ত আদর করতে লাগলেন এবং বললেন, "তুমি আমার চেয়ে অনেক বেশী জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান।" তারপর তারা নিজের বাড়ীর দিকে রওনা হল।

*   *   *

মা বলেছিলেন, এক ভাঙ্গা বাড়ীতে এক গিন্নী ও গিন্নীর ছেলে ও ছেলের বৌ থাকত।

একদিন খুব ঝড় বৃষ্টি আরম্ভ হয়েছে। বাড়ী মনে হচ্ছে যেন দুলছে। ছেলে বুঝতে পারল বাড়ী যে কোন মুহূর্তে ভেঙ্গে পড়ে যেতে পারে।

তখন ছেলে তাড়াতাড়ি করে গিয়ে বৌকে পাশের বাড়ীতে রেখেই,

মার উপরের ঘরে গিয়ে বলল, "মা তুমি শীঘ্র আমার হাত ধর, আমি তোমাকে পাশের বাড়ীতে রেখে দিয়ে আসি, না হলে এখনই বাড়ী পড়ে যাবে—তখন আমরা চাপা পড়ে যাব।"

এমন সময় নীচে নামবার সিঁড়িটা ভেঙ্গে গেল ও ছেলে ভীষণ ভয় পেয়ে গেল। তাই দেখে ছেলের মা ভীষণ গুমরীয়ে উঠল, এবং ছেলেকে নিজের কোলে টেনে নিয়ে বলল, "আয় তোর কে কী করে আমি দেখছি, তারপর আস্তে আস্তে ঝড় থেমে গেল, এবং থেমে গেল বটে বাড়ীর সবই ভেঙ্গে গেছে ; কেবল মা'র ঘরই ভাল আছে। তারপর আস্তে আস্তে ছেলে নীচে নেমে মা'কে মই দিয়ে নীচে নামাল এবং সে যাত্রায় মা ও ছেলের প্রাণ রক্ষা পেল। মায়ের এত প্রবল শক্তি যে, সে নিজের ছেলেকে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাল। মার একটা কথা যে, ইল্লোদ যায় না ধুলে স্বভাব যায় না মলে।

এটা আমরা সকলেই নিজের ও পরের দিয়ে বেশ ভাল উপলব্ধি করতে পারি।

* * *

মা আমাদেরকে চৈত্র মাস আসলেই জলের পাত্র আনতে বলতেন। তারপর মা সেই পাত্রতে জল পূর্ণ করে ছাদেতে রেখে আসতেন। আমি তার কারণ একবার জিজ্ঞাসা করেছিলাম তাতে মা আমাদেরকে বলেছিলেন যে চৈত্র মাস থেকে ভীষণ গরম পড়ে। সেই গরমের জন্য পাখীদের খুব জল পিপাসা পায় এবং জলের জন্য ছটফট করে ; তারা যদি আমাদের বাড়ীতে জল পায় তা'হলে তাদের সেই জল পিপাসা থেকে মুক্তি পায়।

* * *

একবার মা, আমাদের শনিতে পড়লে মানুষের বুদ্ধি কি রকম লোপ পায় সেই সম্বন্ধে বেশ একটা গল্প বলেছিলেন।

এক দেশে এক রাজা ছিল। শনির দৃষ্টি তার উপর পড়াতে তার নানা রকম কষ্ট হয়েছিল। প্রথমেই সে অন্য এক দেশের রাজার সঙ্গে দাবা খেলে হেরে গিয়ে তার রাজ্য হারালো। তখন সে আর রাণী রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল। এর আগে একটু বলবার আছে যে এই রাজা একবার এক মহাভোজ দিয়েছিল এবং ভোজে স্বর্গ মর্ত থেকে সমস্ত দেবতা ও লোক খেতে এসেছিলেন। রাজার এই খাওয়া দাওয়াতে সমস্ত দেবতারা খুব সন্তুষ্ট হয়েছিলেন। এবং প্রত্যেকেই রাজাকে নানা রকম উপহার দিয়েছিলেন। যেমন ব্রহ্মা দিয়েছিলেন যে রাজা বিনা আগুনে রাঁধতে পারবেন। আরো কত দাতা কত রকম উপহার দিয়েছিলেন। রাজা আর রাণী রাস্তায় চলতে চলতে রাণী বলে উঠল যে, রাজা আমি বড় ক্লান্ত হয়েছি. এই গাছ তলায় শুয়ে বিশ্রাম করে নিই। রাজা তাতে রাজী হল, এবং রাণী বিশ্রাম করতে করতে ঘুমিয়ে পড়ল। আর রাজার কিরকম মনে হল, রাজা রাণীর অর্ধেক কাপড় কেটে নিয়ে নিজে সেই কাপড় পরে রাণীকে ফেলে চলে গেল। তারপর রাণী উঠে দেখে যে রাজা নেই। তখন রাণী লোকেদের জিজ্ঞাসা করতে করতে তার বাপের বাড়ী চলে গেল। রাণীর বাবাও রাজা। তখন রাণীর আদেশে রাজাকে খুঁজতে নানা দেশে সমস্ত লোক বেরিয়ে পড়ল, কিন্তু কেউই পেল না। ইতিমধ্যে সেই রাজা এক রাজার সহিসের কাজ করতে লেগে গেছে। একবার সেই রাণীর বাপের বাড়ীতে এক স্বয়ম্বর সভা হয়, তাই সমস্ত দেশের রাজার নিমন্ত্রণ হয়েছে। কিন্তু কাজের জন্য যেতে দেরি হয়ে গেছে। মাত্র দুই দিন আছে। কিন্তু সেখানে যেতে চার দিন লাগে। রাজা তার সহিসকে ডেকে বলল যে, তুমি তো এদের মধ্যে সবার চেয়ে ভাল ঘোড়া চালাও তা আমাকে কি দুই দিনে নিয়ে যেতে পারবে। সহিস জানতো যে এই রাজা শনি

ছাড়াবার এক মন্ত্র জানে, তাই সে বললে, আপনি আমায় যদি শনির দশা ছাড়িয়ে দিতে পারেন তো আমি আপনাকে তুই দিনে নিয়ে যাব, রাজা রাজি হল এবং সে তখন রাজাকে তুই দিনে নিয়ে গেল। উপর থেকে সহিসকে দেখে রাণীর মনে হয়েছে, এই বোধ হয় আমার স্বামী, তখন সে তার ঝিকে তার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছে আর বলেছে যে, ঐ লোকটা কি করে দেখতো ? ঝি গিয়ে দেখে, লোকটি বিনা আগুনে রেঁধে খাচ্ছে। তাই দেখে রাণীকে জানাল। রাণী তখন রাজাকে রাজপুরিতে নিয়ে আসল ও পরস্পর পরস্পরকে চিনতে পেরে কত আনন্দ উপভোগ করল। তার রাজ্য যে নিয়েছিল সে তার রাজ্য চালাতে না পেরে তাকে ফেরৎ দিয়ে দিল। তারপর তারা আবার আগের আনন্দে নিজের রাজ্যতে বাস করতে লাগল।

* * *

একবার আমার গায়েতে এক টিকটিকি পড়েছিল। আমার তখন মনে হল যে, আমি শুনেছি, টিকটিকি গায়ে পড়লে অমঙ্গল হয়। তাই আমি মাকে গিয়ে বললাম, আমার গায়ে টিকটিকি পড়েছে। টিকটিকি পড়লে কী হয় ? মা আমার দিকে তাকিয়ে বুঝলো যে পল্টু ভয় পেয়েছে। মা বলল, টিকটিকি গায়ে পড়লে রাজা হয়। আমি সেই কথা শুনে হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম।

* * *

আমরা মা'র কাছে 'প্রায়-ই বলতাম, মা একটা গল্প বল না, আমরা শুনি।

তাই মা আমাদের এক বেঁজীর গল্প বলেছিলেন। এক রাজার রাজ্যে তিন রাণী ছিল ; কিন্তু তিন রাণীর-ই কোন ছেলেপিলে হয় নি। একদিন এক ভিক্ষুক এসে বলছে, "মা আমায় দু'টো ভিক্ষা দেবে।" তখন তিন রাণীই এসে তাকে ভিক্ষা দিল এবং ভিক্ষুকটি খুব সন্তুষ্ট হয়ে বললে যে "তোমরা ও তোমাদের ছেলেপিলে সুখে থাকুক।"

রাণীরা তার কথা শুনে বলে উঠল, আমাদের আবার ছেলে পিলে কই যে, আমাদের ছেলে পিলে সুখে থাকবে?" তখন ভিক্ষুকটি তার বোঝা থেকে এক শেকড় বের করে বলল যে, "তোমরা এই শেকড়টা কাল সকালে উঠে বাসি মুখে স্নান করে বেটে জল দিয়ে গিলে খেয়ে ফেলবে, তা'হলে তোমাদের তিন জনারই ছেলে হবে।"

তারা এই শেকড় পেয়ে খুব আনন্দ করতে লাগল। কিন্তু বড় দুই রাণী যুক্তি করে ঠিক করল যে, তারা কাল অন্ধকার থাকতে উঠে কাজ-টাজ সেরে ছোটরাণীকে না দিয়ে তারাই খাবে। তাহলে তাদেরই ছেলে হবে ও রাজা কেবল তাদের দু'জনাকেই ভালবাসবে।

তারপরের দিন বড় দুই রাণী আগের দিনে যা ঠিক করেছিল, সেই সব করে যখন স্নান করে বাড়ী ফিরছে ; তখন ছোট রাণী কাজ সেরে স্নান করতে যাচ্ছে। পথে তাদের সঙ্গে ছোট রাণীর দেখা হ'ল এবং ছোট রাণী তাদের বার বার করে বলল, যেন তারা তার জন্য অল্প একটু রেখে দেয়। তারাও ছোট রাণীকে বললে, হ্যাঁ নিশ্চয়ই তার জন্য রেখে দেবে। ছোট রাণী স্নান করে যখন বাড়ী ফিরল, তখন দেখে যে, তার জন্য কিছু রাখা হয় নি। সে গিয়ে বড় রাণীকে জিজ্ঞাসা করলে এবং উত্তরে তারা বললে, "এই যা, আমাদের তো একটুও মনে নেই। তা তুই তাহলে ও শিলটা ধুয়ে জলটুকু খেয়ে ফেল।" তখন ছোট রাণী আর গত্যন্তর না দেখে ঐ করল।

তারপর বড় দুই রাণীর দুই চমৎকার ছেলে হ'ল ; কিন্তু ছোট রাণীর এক বেঁজী হল। রাজা দুই রাণীর ছেলে হওয়া দেখে খুব আদর করতে লাগল ; কিন্তু ছোট রাণীর বেঁজী হওয়া দেখে তাকে নানা প্রকার তিরস্কার করে তাকে ঘোড়ার আস্তাবলে পাঠিয়ে দিল। তখন থেকে ছোট রাণী ঘোড়ার ঘর পরিষ্কার করে আর বেঁজীকে মানুষ করতে থাকে। বেঁজী বড হয়ে তার বাবার কথা জিজ্ঞাসা করে ; তখন ছোট রাণী সমস্ত বৃত্তান্ত তাকে বলে। বেঁজী বাবার কাছে যায় কিন্তু বাবা কখনই তাকে আদর করে না। কিন্তু অপর দুই ছেলেকে কত আদর করে।

একদিন রাজার বড় দুই ছেলে বললে যে, তারা ব্যবসা করতে বিদেশে যাবে। রাজা তখন নৌকা ভর্ত্তি করে সমস্ত মাল কিনে দিল ও তারা ঐ সমস্ত জিনিষপত্র নিয়ে বিদেশে চলে গেল। বেঁজী মাকে গিয়ে বলল, "আমিও যাব।" মা বললে, "বাবার কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করো।" রাজা তখন এক ভাঙ্গা নৌকা দিয়ে তাকে পাঠিয়ে দিল। বেঁজী যেতে যেতে এক দেশে গিয়ে পৌঁছল এবং সেখানে কোন মানুষ দেখতে পেল না। কিন্তু এক প্রকাণ্ড বাড়ী দেখতে পেল। বেঁজী সেখানে গিয়ে ঢুকলো। সেখানে এক অপরূপ সুন্দরীকে ছাড়া আর কাউকে দেখতে পেল না। এবং তাকে ঘুমিয়ে থাকতে দেখল। তাকে কত ডাকল, কোন সাড়া শব্দ পেল না।

তখন তার পাশে একটা সোনার আর একটা রূপার কাঠি দেখতে পেল। বেঁজী যখনই তার গায়ে রূপার কাঠিটি ছোঁয়াল, তখন যেন আরও বেশী ঘুমিয়ে পড়ল সে। তারপর আবার সে যখনই সোনার কাঠিটি ছোঁয়াল, তখনই ঐ কন্যাটি জেগে উঠল এবং বলল, "তুমি এখানে কেন ? এখনই তোমাকে রাক্ষসরা এসে মেরে ফেলবে। তুমি এখান থেকে এখনই চলে যাও।" বেঁজী তার কথা শুনে বললে যে, "তোমার কোন ভয় নেই। তুমি এখানে একলা থাক না কি ?" মেয়েটি সেই কথা শুনে বললে যে, এখানে তাদের রাজ্য ছিল এবং তার বাবা এখানকার

রাজা ছিল। কিন্তু এখানে এত রাক্ষস হয়ে গেল যে, তাদের সবাইকে এবং এদেশের সমস্ত লোককে তারা মেরে ফেলল। কেবল তাকে এক বুড়ো রাক্ষস মারতে দেয়নি। সে রোজ তার ঘরে আসে এবং তাকে রোজ পা মালিশ করে দিতে হয়। তাই শুনে বেঁজী বলল, তাকে সে যেন আজ পা মালিশ করে দেয়, আর চোখে সরসের তেল দিয়ে কাঁদার ভান করে।

রাক্ষস তাই দেখে তাকে জিজ্ঞাসা করবে, তার কি হয়েছে? সে তখন বলবে যে, তার ভয় হচ্ছে যে, সে বুড়ো হয়েছে কবে মারা যাবে, আর অন্য রাক্ষসরা তাকে মেরে ফেলবে। তখন রাক্ষস কি বলে, যেন সে শোনে। তারপর মেয়েটি বেঁজীর কথানুসারে তাই করল। এবং রাক্ষসের কাছ থেকে শুনে রাখল যে, তার বাবার পুকুরে এক কৌটাতে ছুটো কাঁকড়া আছে। যদি কেউ এক ডুবে ঐ কাঁকড়া দু'টো তুলে এক কোপে মারতে পারে; তাহলে দেশে যত রাক্ষস আছে সব মরে যাবে। তার পরের দিন বেঁজী এসে সব শুনলো. এবং বললে যে, হ্যাঁ সে এখনই তাহলে তাই করবে।

মেয়েটি ভয়ে বললে, "খবরদার তুমি ও কাজ করনা। তা'হলে তুমিই মারা যাবে।"

বেঁজী কথা না শুনে পুকুরে গেল এবং রাক্ষসের কথা মত সমস্ত কিছু করা মাত্র সমস্ত রাক্ষস বিকট চিৎকার করতে করতে এসে সেই পুকুরে পড়তে লাগল আর মরতে লাগল। এই রকম করার পর সমস্ত রাক্ষস মারা গেল।

তখন সে ঐ বাড়ীতে গেল এবং মেয়েটিকে জাগিয়ে বললে যে, সে সমস্ত রাক্ষস মেরে ফেলেছে। মেয়েটি তখন বেঁজীর সঙ্গে গিয়ে দেখল, সত্যিই তো! তারপর মেয়েটি আর বেঁজীটি তাদের বাড়ীর এক ঘরে যেতে লাগল আর দেখতে লাগল, মরা মানুষের মুণ্ডু, হাড় ইত্যাদি, এবং তারা সেই সব দরজা বন্ধ করে দিতে লাগল।

তারপর এক ঘরে গিয়ে হীরে, জহরৎ, ইত্যাদি দেখতে পেল। তখন বেঁজী আর মেয়েটি কয়েকখানা নৌকা ঠিক করে ঐ সমস্ত জিনিষ দিয়ে বোঝাই করে দুজনাতেই বেঁজীর বাড়ীর দিকে রওনা হ'ল—এবং কয়েকদিনের মধ্যে বাড়ীর ঘাটে গিয়ে পৌঁছাল।

এর আগে বড় দুই রাণীর দুই ছেলে বিনা রোজগারে বাড়ী ফিরেছিল এবং রাজার তাই দেখে ভারি দুঃখ হয়েছিল। আর বেঁজী—এত জিনিষপত্র আনতে দেখে রাজপুরীর সমস্ত লোক ছোটরাণীর কাছে গিয়ে জানাল। রাণী প্রথমে কিছুতেই বিশ্বাস করল না। শেষকালে বেঁজী আর এ মেয়েটি এসে ছোটরাণীকে প্রণাম করতে রাণী বিশ্বাস করল। এবং তারা রাজাকেও গিয়ে প্রণাম করতে, রাজা ভারী খুসী হল, অবাকও হলো এবং ছোটরাণীকে সাথে সাথে আবার তার ঘরে নিল ও কত আদর করতে লাগল।

তারপর বেঁজীর সঙ্গে ঐ অপরূপ সুন্দরী মেয়েটির খুব ধূমধাম করে বিবাহ হ'ল এবং সকলে আনন্দে রাজপুরীতে বাস করতে লাগল।

* * *

মা আমাদের বলেছিলেন যে, যদি ভগবানের কারো উপর দয়া হয়, তাহলে তিনি নানারকম ভাবে তার কাছে আবির্ভূত হন।

একবার পুরীতে এক খাবারের দোকানে জগন্নাথ ঠাকুর সাধারণ মানুষের বেশে গিয়ে খাবার খেতে চান এবং দোকানের লোকেরা সেইসব খাবার খেতে দেন, আরো পাঁচজনের মতই। খাওয়া হলে জগন্নাথ ঠাকুর বললেন যে, "দেখ আমার কাছে এখন টাকাকড়ি নেই :

তা তুমি আমার এই আংটিটা নাও, পরে আমার লোক এসে তোমার মিষ্টির দাম দিয়ে, আমার আংটি নিয়ে যাবে।"

তারপরে রাত্রিতে পুরীর জগন্নাথের একজন ভারকর্তা স্বপ্ন দেখে যে, ঠাকুর এসে বলছেন, "আমি ঐ খাবারের দোকানে গিয়ে খেয়ে এসেছি, এত টাকা দাম হয়েছে। তুই ওর সেই সব দাম দিয়ে আমার আংটি নিয়ে আমাকে পরিয়ে দে।" তারপর সে জগন্নাথের কথানুসারে সেই দোকানে গিয়ে সমস্ত বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করেন। তার উত্তরে দোকানওয়ালা যা বলে, লোকটার স্বপ্নের সঙ্গে সমস্তই মিলে যায়। তখন লোকটা টাকা বের করে আংটিটি চাইল। খাবারওয়ালা তার কথা শুনে অবাক হয়ে গেল এবং বলল, "বাবা জগন্নাথের আমার উপর এত দয়া হয়েছিল!"

সে তখন আনন্দে বলল, আমি টাকা নেব না। আমি আপনার সঙ্গে গিয়ে, বাবা জগন্নাথের হাতের আঙুলে আংটিটি পরিয়ে দিতে পারি যাতে তার ব্যবস্থা করুন। তখন ঐ ভক্ত তাই করল। দোকানওয়ালা বাবা জগন্নাথকে আংটিটি পরিয়ে দিয়ে—প্রণাম করার সাথে সাথে জগন্নাথের সাথে মিশিয়ে গেল।

* * *

মা বলেছিলেন যে, একজন ভদ্রলোক একবার বৃন্দাবনে গিয়েছিলেন। বৃন্দাবনের যাবতীয় দর্শন করে যখন বাড়ী ফিরবার বন্দোবস্ত করছেন; এমন সময় কতকগুলি চমৎকার পাথর তাঁর চোখে পড়ল। তখন তিনি ঐ পাথরগুলি তুলে নিয়ে তাঁর দেশে চলে আসলেন।

পাথরগুলিকে তারপর বাড়ীর এক আলমারিতে যত্ন করে রেখে দিলেন।

তার কয়েকদিন বাদে একজন সাধু তাদের বাড়ীতে এসে এক রাত্তিরের জন্য আশ্রয় চাইল। সেই সাধুটিকে তাঁর বাড়ীর সামনের ঘরে আশ্রয় দিলেন।

রাত্রিতে সাধু ঘুমিয়ে আছে ; এমন সময় স্বপ্ন দেখলেন যে, কতকগুলি পাথর যেন তাঁকে বলছে যে, আমরা বৃন্দাবনে থাকতাম। বাড়ীর কর্তা আমাদের এখানে এনে রেখেছে। ওখানে যখন আমরা থাকতাম, কত আনন্দে ছিলাম। আমরা সারাদিন খেলা করে কাটাতাম। কিন্তু ঐ ভদ্রলোক আমাদের এখানে আনার পর থেকে, মোটেই আমাদের ভাল লাগছে না। আমরা এখানে বন্দী। আপনি যদি আমাদেরকে আমাদের জায়গায় রেখে আসেন তাহলে খুব ভাল হয়।

সকালে উঠে সাধু তার স্বপ্নের কথাটা গৃহীকে জানাল এবং গৃহী সেই কথা শুনে অবাক হয়ে গিয়ে পরের দিন পাথরগুলিকে বৃন্দাবনে রাখতে চলে গেলেন।

*   *   *

এক দেশে এক রাজার এক ছেলে ছিল। সে রোজ সকালে ঘোড়ায় চড়ে সারাটা রাজ্য ঘুরে বেড়াত।

তার রাজ্যের মধ্যে একটা প্রকাণ্ড বড় ক্ষেত ছিল। সেই ক্ষেতেতে এক প্রকাণ্ড বড় মূলো জন্মেছিল। মালী রোজই ভাবত মূলোটা এত বড় হয়েছে আরও বড় হোক। তারপর অনেক দাম দিয়ে বিক্রী করবে,

কিন্তু সেই মূলোর মধ্যে এক অপরূপ সুন্দরী মেয়ে বাস করত। যখন মালী বাড়ী থাকত তখন মেয়েটি মূলোর মধ্যে থেকে বেরিয়ে পুকুরে স্নান করে আবার মূলোর মধ্যে ঢুকে যেত, কিন্তু মালী এসে কিছুই বুঝতে পারত না।

একদিন রাজার ছেলে বেড়াতে বেড়াতে দেখে যে, ঐ মূলোর মধ্যে থেকে মেয়েটি বার হয়ে পুকুরে স্নান করতে গেল। তখন রাজার ছেলে মালীর কাছে গিয়ে জানাল যে, আমি ঐ মূলোটা কিনব। মালী প্রথমে বলল যে, "আমি ঐ মূলোটা আরও বড় হওয়ার জন্য অপেক্ষা করছিলাম ; কিন্তু আপনি যখন বলছেন, তখন আর কি করে না করি।" তারপর রাজার ছেলে ঐ মূলোটা কিনে বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে দরজা বন্ধ করে রেখে দিল।

বাড়ীর লোকেরা ব্যাপারটা কিছুই জানে না, তাই তারা সেই ঘরের দরজা খোলবার জন্য রাজার ছেলেকে অনুরোধ করল ; কিন্তু রাজার ছেলে খালি বলে যে, "তোমরা যদি আমার একটা কথা রাখ, তা'হলে আমি দরজা খুলব।" শেষকালে সবাই বলল, তুমি যা বলবে—তাই শুনব। দরজা খোল আগে।

তখন রাজার ছেলে দরজা খুলে বলল, আমি এই মেয়েটিকে বিয়ে করব।

তখন মেয়েটি রাজার ছেলের ঐ কথা শুনে জানাল যে, সে যেখানে ছিল, সেখানেই তার ভাল লাগত। রাজার ছেলে তাকে নানারূপ ভাবে বোঝাল এবং বলল যে, "তোমার কোন ভয় নেই ; তুমি যা করতে ইচ্ছা কর সবই এখানে পাবে।" তারপর তাদের দুজনার সঙ্গে বিবাহ হয়ে গেল ও তারা খুব আনন্দে বসবাস করতে লাগল।

* * *

মা আমাদেরকে রামনামের মাহাত্ম্য কি তা বুঝিয়ে দিয়েছিলেন।

মা বলতেন, যে বাল্মিকী রামায়ণ লিখেছে, সে এক কালে এক ভীষণ দস্যু ছিল। সমস্ত লোককে মেরে ধরে টাকা পয়সা নিয়ে নিত। এক সময় এক সাধু ঐ রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে; তাকে দেখে দস্যু এসে ধরল এবং মারতে গেল। সেই দেখে সাধু তাকে বলল, "দেখ, তুমি যে এমন কাজ কর, তার পাপের ফল কি হবে পরে একবারও কি ভাব?" সে তখন বলে উঠল, "যা পাপ সে তো আমি একলা ভোগ করব না। আমার বাড়ীর সবাই তার পাপের ফল ভোগ করবে।" তখন সাধু তাকে বাড়ীতে গিয়ে সমস্ত লোককে একবার জিজ্ঞাসা করে আসতে বলল যে, "এই পাপের ভাগ কি তারাও সমান ভাগ নেবে?" দস্যুতো প্রথমে রাজী হ'ল না; তারপরে বলল, "তুমি আমায় ফাঁকি দিয়ে, পালিয়ে যেতে চেষ্টা করছ?" সাধু তখন বলল যে, "তুমি তাহলে আমায় দড়ি দিয়ে গাছের সঙ্গে বেঁধে রেখে যাও। তারপর এসে যা করবার করবে।"

দস্যু সাধুর কথামত সাধুকে বেঁধে রেখে, বাড়ীতে গিয়ে বাবা মা'কে প্রথমে জিজ্ঞাসা করল যে, "আমি যে তোমাদের জন্য সারাদিন কষ্ট করে লোকের উপর নানারূপ উপদ্রব করে খাওয়াচ্ছি, তার পাপের ভাগ তোমরা নেবে তো?" বাবা-মা তার উত্তরে বলল, "তা আমরা নিতে যাব কেন? আমরা তোমাকে কত কষ্ট করে বড় করেছি, এখন আমরা বুড়ো হয়েছি; তোমায় তো এখন আমাদের খাওয়াতে হবে।"

তারপর সে স্ত্রীর কাছে গিয়েও বলল যে, সে তো তার পাপের ভাগ নেবে? স্ত্রী স্বামীর কথা শুনে বলল যে, "তুমি আমাকে বিবাহ করেছ; তোমাকে তো আমার ভরণ পোষণ করতেই হবে, তার আবার পাপের ভাগ কি?" তখন দস্যুর মাথায় যেন বজ্র পড়ল। তখন সে তাড়াতাড়ি সাধুর কাছে গিয়ে তার দড়ি খুলে দিয়ে ক্ষমা চাইল এবং বলল, "এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত কি করলে হবে?" সাধু তার কথার

উত্তরে বলল, "তুমি এখন থেকে খালি রাম নাম করতে থাক, তাহলে তোমার পাপটাপ সব কেটে যাবে।"

দস্যু এত পাপ করেছে যে, আর তার মুখ দিয়ে কিছুতেই রাম-নাম সাধু বের করাতে পারল না। সে খালি-ই বলে, মরা মরা। তখন সাধু বলল, তাহলে তুমি মরা মরাই সারাদিন ভজ।

তারপর দস্যু সেই বনের মধ্যে গিয়ে সারারাত সারাদিন "মরা মরা" ভজতে লাগল। তারপর সেই সাধু অনেক বৎসর পর ঐ খানে এসে দেখে যে, রামনাম বেরোচ্ছে।

সাধু চারিদিকে তাকিয়ে কিছুই দেখতে পেল না। তারপর ধ্যানে বুঝতে পারল যে, দস্যু রাম নাম করতে করতে আর তার শরীরে পাপ নেই। তার শরীরের উপরে উই-এর ঢিপি হয়ে গেছে এবং ভীষণ পুরু হয়েছে।

তখন সাধু বৃষ্টির আহ্বান করল। ক'দিন ধরে একভাবে বৃষ্টি হ'ল এবং সমস্ত উই ঢিপি গলে গিয়ে সেই দস্যু বের হলো। তখন সাধু তাকে বলল যে, তোমার শরীরে আর বিন্দুমাত্র পাপ নেই। তারপর তার নাম হল বাল্মিকী। বাল্মিকীই শেষকালে রামায়ণ রচনা করে জগৎ বিখ্যাত হন।

* * *

মহাভারতের দেবব্রতের নাম ভীষ্ম কেন হয়েছিল, মা তা আমাদেরকে গল্প করে জানিয়েছিলেন।

স্বর্গে বসু নামে যে আটটি দেবতা আছেন, অনেক দিন আগে

তাঁহারা একটা অপরাধ করিয়া ফেলিয়া ঋষির কোপে পড়িয়া যান। ঋষি ক্রুদ্ধ হইয়া অভিশাপ দিলেন, তোরা পৃথিবীতে মানুষ হইয়া জন্ম গ্রহণ করবি। ভয়ে ও দুঃখে বসুদেবের মুখ শুকাইয়া গেল, তাঁহারা ঋষির পায়ে ধরিয়া কান্নাকাটি করিতে লাগিলেন, কিন্তু ঋষির কথা তো আর মিথ্যা হইবার নয়। ঋষি বলিলেন, পৃথিবীতে তোমাদের যাইতে হইবে, তবে তোমাদের মধ্যে বড় সাত জন ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র শাপ মুক্ত হইয়া আবার স্বর্গে চলিয়া আসিবে। কেবল ছোট ভাই দ্যু যার অপরাধ বেশী তাহাকে কিছু দিন মানুষের মধ্যে কাটাইতে হইবে। অগত্যা তাঁহারা পৃথিবীতে আসিবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন, কিন্তু তাহাদের চিন্তা হইল যে, কে পৃথিবীতে তাঁহাদের মা হইবেন? দেবতারা তো আর সাধারণ মেয়েকে মা বলিতে পারেন না, শেষ পর্যন্ত তাহারা আসিয়া গঙ্গার স্মরণাপন্ন হইলেন, বলিলেন, মা, তোমাকেই পৃথিবীতে যাইতে হইবে, তুমি হইবে আট ভাইয়ের মা।

গঙ্গা তাহাদের কথা ঠেলিতে পারিলেন না। তিনি আসিলেন, আবার বিবাহ করিলেন। কুরুবংশের মহাপ্রতাপশালী রাজা শান্তনুকে। ইহার পর গঙ্গার পর পর আটটি ছেলে হইল। প্রথম সাতটি ছেলে জন্মের পরই মারা গেল, অষ্টমটির জন্মের পর গঙ্গা শান্তনুকে নিজের পরিচয় দিলেন এবং ছেলেটিকে তাহার হাতে সঁপিয়া দিয়া কহিলেন, ইহাকে যত্ন করিয়া মানুষ করিও, এ ছেলে তোমাদের বংশের নাম রাখিবে।

তাহার পর তিনি স্বর্গে চলিয়া গেলেন। শান্তনু ছেলেটিকে যত্ন সহকারেই পালন করিতে লাগিলেন। ছেলেটির নাম হইল দেবব্রত। দেবব্রতের যেমনি সুন্দর চেহারা তেমনি তাহার মিষ্ট স্বভাব। লেখাপড়া ও অস্ত্রচালনা তিনি খুব মনোযোগ দিয়া শিখিলেন। স্বয়ং পরশুরাম দেবব্রতকে যুদ্ধ কৌশল শিখাইয়া একেবারে অজেয় করিয়া তুলিলেন।

এধারে কয়েক বছর কাটিয়া যাইবার পর শান্তনুর আবার ইচ্ছা হইল

যে তিনি আবার বিবাহ করিবেন। সত্যবতী বলিয়া একটি মেয়েকেও তিনি পছন্দ করিলেন। কিন্তু সত্যবতীর পিতা শান্তনুকে মেয়ে দিতে রাজী হইলেন না। তিনি বলিলেন, তোমাকে মেয়ে দিয়ে লাভ কী? তোমার বড় ছেলে আছে। তোমার পরে সেই রাজা হইবে, আমার নাতিরা কি তখন তাহার তাঁবেদারী করিবে? যদি এমন কথা দাও যে, তোমার মৃত্যুর পর সিংহাসন আমার নাতিদের দিয়া যাইবে, তাহলেও না-হয় কথাটা বিবেচনা করিতে পারি। কিন্তু শান্তনু একথায় কি করিয়া রাজি হন। তাঁহার অমন সোনার চাঁদ ছেলে। ছেলের মতো ছেলে। সিংহাসনে বসিবার উপযুক্ত ছেলে। তিনি মলিন মুখে ফিরিয়া আসিলেন। কথাটা কিন্তু দেবব্রতের কানে পৌঁছিল। পিতার ম্লান মুখ দেখিয়া তাঁহার বড় কষ্ট হইল. তিনি সোজা সত্যবতীর পিতার কাছে গিয়া বলিলেন, আপনি বাবার সহিত স্বচ্ছন্দে মেয়ের বিবাহ দিতে পারেন। আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, আপনার মেয়ের যে ছেলে হইবে, সেই সিংহাসনে বসিবে। আমি রাজা হইতে চাহিব না। সত্যবতীর বাবা লোকটি অত সহজ নন, তিনি জবাব দিলেন. আরে সেই কি একটা কথা হয়? তুমি না-হয় সিংহাসন ছাড়িয়া দিলে, তোমার ছেলেরা ছাড়িবে কেন? তাহারা যদি পরে আমার নাতির সহিত ঝগড়া বাধায়? দেবব্রত তৎক্ষণাৎ প্রতিজ্ঞা করিলেন, বেশ আমি আপনাকে কথা দিলাম, আমি বিবাহই করিব না। তাহা হইলে তো আর কোন বাধা থাকিবে না। সত্যবতীর বাবা তখন প্রসন্ন মনেই বিবাহে মত দিলেন। দেবতারা স্বর্গ হইতে দেবব্রতের এই স্বার্থ ত্যাগ দেখিয়া পুষ্প বৃষ্টি করিতে লাগিলেন, আর তাহার এই ভীষণ প্রতিজ্ঞার জন্য সকলে তাহার নাম রাখিল 'ভীষ্ম'। সেই হইতে তিনি ভীষ্ম নামে পরিচিত হইলেন।

* * *

মা আমাদেরকে বলেছিল যে, এক গ্রামে এক বাড়ীতে অনেকগুলো গরু ছিল। রোজ বাড়ীর গিন্নী গরুর সমস্ত কিছু কাজ করে। একদিন সকালে গিন্নি বেটার বৌ'কে ডেকে বলল যে, দেখ বৌ, আজ আমি বিশেষ কাজে এখন চলে যাচ্ছি; তা তুমি গরুর কাজ করার আগে সুবচুনি পূজাটা করে কাজটাজ কর। কারণ আজ সুবচুনি পূজা। বৌ বলল, আচ্ছা মা আমি তাই করব, আপনি যেখানে যাবেন যান। তারপর বাড়ীর গিন্নী চলে গেল। এধারে বেটার বৌ-এর আর পূজার কথা মনে নেই।

সে সকালে উঠে যে কাজেই হাত দেয় সেই কাজ-ই আর ভালো হয় না।

সে যখন গরু ঠিক করতে গেছে, তখন গরুগুলো সমস্ত দড়ি ছিঁড়ে পালিয়ে গেল। কিছুতেই ধরতে পারল না। মনে তার ভারি কষ্ট হ'ল।

তারপর বৌ যখন দুধ নিয়ে ঘোল করতে গিয়েছে; তখন ঘোলের ঘড়াটা ভেঙে গিয়ে সমস্ত দুধ নষ্ট হয়ে গেল। এই সব হতে দেখে তার মনে ভারি কষ্ট হ'ল যে আজ একদিন আমার শাশুড়ী একটা কাজের ভার দিয়ে গেছে, আর আমি সব কিছু নষ্ট করছি। তাহলে শাশুড়ী এসে আমাকে কত বকবে।

এমন সময় বে'টার বৌ দেখে, একজন মেয়ে লোক পান খেতে খেতে হাতে এক লাঠি নিয়ে পায়ে খড়ম পরে তার কাছে এসে জিজ্ঞাসা করছে যে, তোর কি হয়েছে ? অমন করে কাঁদছিলি যে। তখন বে'টার বৌ সমস্ত খুলে বলল এবং বলল যে, "আমার শাশুড়ী এসে আমাকে কত বকবে ?"

মেয়েলোকটি তাই শুনে বলল যে, আচ্ছা তোর শাশুড়ী কাজের আগে কি করতে বলেছিল মনে করে দেখ তো।

তখন বেটার বৌ বলে উঠল, 'এই—যা—! আমাকে যে সুবচুনি

পূজা করতে বলেছিল।" তখন মেয়েলোকটি বলল যে, "যা সমস্ত জিনিসপত্র এনে আমার সামনে পূজা কর।" বেটার বৌ ঘরে যা ছিল তাই এনে মেয়েলোকটার সামনে খুব ভক্তিভরে পূজা করল।

পূজা হয়ে গেলে মেয়েলোকটি বলল, 'যা এবার তুই জিনিসপত্রগুলো অন্য ঘরে রেখে দিয়ে আয়। যেমনি বেটার বৌ জিনিসগুলো রেখে আবার ঘরে এসেছে অমনি দেখে সেই মেয়েলোকটি নেই। চারধারে কত খুঁজল; কিছুতেই আর তাকে পেল না। শেষকালে বেটার বৌ দেখে যে, ঘোলের ঘড়াটাও জোড়া লেগে গেছে ও সোনার হয়ে গেছে। বাড়ীও সোনার হয়ে গেছে। গরুগুলোও আবার হাম্বা হাম্বা করতে করতে সব ঘরে চলে আসল। চারধারে সমস্ত ভালো হয়ে গেল। তখন তার মনেও খুব আনন্দ হ'ল।

তারপর বেটার বৌ খালি বাইরে আর ভিতরে করতে লাগল, যাতে শাশুড়ী বাড়ী না চিনতে পেরে চলে না যায়।

এধারে শাশুড়ী বাড়ীর সামনে এসে খালি আনাগোনা করছে আর ভাবছে, এক সকালের মধ্যে আমাদের বাড়ী তুলে ফেলে কোন রাজার বাড়ী হ'ল?

এমন সময় বেটার বৌ শাশুড়ীকে ডেকে ঘরে এনে সমস্ত কথা খুলে বলল।

তখন শাশুড়ী বৌকে আদর করে আর শেষ করতে পারে না।

আমার মা এই গল্পটা বলে বলতেন যে, যদি সুবচুনি পূজা করা যায়, তাহলে লোক বিপদ থেকে উদ্ধার হতে পারে।

* * *

মা বাবাকে বলতেন যে, কৃষ্ণ এক সময় স্বর্গে গিয়ে এক চমৎকার ফুলের মালা এনে এক স্ত্রীকে দেয়; তাকে সেই ফুলের মালা দিতে

দেখে অন্য আর এক স্ত্রী কৃষ্ণকে বললে যে, "তুমি ওকেই বেশী ভালোবাস; আমাকে মোটেই ভালোবাস না।" কৃষ্ণ সেই কথা শুনে জিজ্ঞাসা করল, "কেন?" তার উত্তরে সে বললে যে, "তুমি ওকে ঐ ফুলের মালা দিয়েছ; আমাকে তো দিলে না। আমাকে যদি ঐ ফুলের মালা না দাও, তাহলে তোমার সঙ্গে আমি আর কথাই বলব না।"

কৃষ্ণ তাকে অনেক করে বোঝাল; কিন্তু সে কিছুতেই বুঝলো না। অবশেষে তার এই অভিমান ভাঙ্গানোর জন্য কৃষ্ণ স্বর্গে সেই ফুল আনবার জন্যে চলল। গিয়ে মালির কাছে ঐ ফুল চাওয়া মাত্রই মালি তো বললে যে, আমি ঐ ফুল দিতে পারব না। মালিক আমাকে দিতে বারণ করেছে। মালির কাছে না পেয়ে কৃষ্ণ মালিকের কাছে গিয়ে সেই ফুল চাইল। সেও দিল না; অবশেষে কৃষ্ণ তার সঙ্গে যুদ্ধ করল এবং তাকে পরাস্ত করে সেই ফুল সংগ্রহ করল এবং তার স্ত্রীকে সেই ফুল দিয়ে অভিমান ভাঙালো। মা এই গল্প বাবাকে বলে বলত যে, দেখ স্বয়ং ভগবান তার স্ত্রীর অভিমান ভাঙ্গাবার জন্য কত কষ্ট সহ্য করলেন আর আমরা তো সাধারণ মানুষ, আমরা স্বামীর কাছে কথায় কথায় অভিমান করব এবং সেটা স্বামীর সহ্য করা উচিত। স্বয়ং ভগবান স্ত্রীর অভিমান ভাঙ্গাবার জন্য যুদ্ধ করতেও ইতস্ততঃ করেন নি।

* * *

মাঝে মাঝে মা আমাদের গল্পের মাধ্যমে শিক্ষাও দিতেন।

একদিন দুই চোর এক কাঁসারীর দোকানে গেল বাসন কিনতে। কাঁসারী তখন অন্যদের নিয়ে ব্যস্ত ছিল। এই অবসরে একজন চোর

একটি ঘটি চুরি করে সাথী চোরের হাতে দিল। সে নিজের কাপড়ের মধ্যে সেটি লুকিয়ে রাখল।

অন্য খরিদ্দার চলে গেল, কাঁসারী দেখল, তার একটি ঘটি নেই।

তখন ঐ তুজনকে সে চোর বলে ধরল। তুই চোর শপথ করে চুরির কথা অস্বীকার করল।

যে চুরি করেছিল সে বলল, ঘটি আমার কাছে নেই। যে ব্যক্তি লুকিয়ে রেখেছিল, সে বলল, আমি তোমার ঘটি নেই নি।

কাঁসারী চোর ধরতে পারল না। সে বলল, তোমরা চুরির কথা স্বীকার করলে না। মিথ্যা বললে। এর উচিত শাস্তি নিশ্চয় পাবে।

মা বলতেন যে, এর তাৎপর্য হল, চুরি করা মহাপাপ। চুরি করা উচিত নয়।

* * *

তখন শীতকাল। নদীর ধার দিয়ে যাচ্ছিল একজন কৃষক। সে দেখল একটি সাপ মাটিতে পড়ে আছে। শিশিরে ভিজে আর কাদা মেখে তার মারা যাওয়ার অবস্থা।

তাকে দেখে কৃষকের দয়া হোল। যত্ন করে বাড়ী নিয়ে এল।

আগুনের তাপ দিয়ে বাঁচাল সাপটিকে। সে প্রতি দিন তাকে তুধ কলা খেতে দেয়। কৃষকের ছেলে হোল তার বন্ধু। সাপটির দিন বেশ সুখেই কাটছিল।

একদিন কৃষক বাড়ীতে ছিল না। সাপ আর ছেলেটি খেলা করছিল। হঠাৎ ছেলেটি সাপের গায়ে আঘাত করল। সাপ একে

খেলা মনে না করে, ছেলেটিকে কামড়াল। সঙ্গে সঙ্গে মরে গেল ছেলেটি।

কৃষক বাড়ী ফিরে এল। এসে দেখে ছেলেটি সাপের কামড়ে মারা গেছে। সে সাপকে অনেক গালি দিল। বলল. ওরে পাপী, তোকে প্রায় মৃত অবস্থা থেকে এনে আমি বাঁচিয়েছিলাম। তোকে প্রতিপালন করলাম। তার কি এই ফল !

সাপ বলল, তুমি ঠিক কাজ কর নি। আমার উপকার করাতেই তোমার অপকার হয়েছে।

মা বলতেন, এর তাৎপর্য হল, হিংস্র জন্তুকে বিশ্বাস করা মানুষের উচিত নয়।

* * *

এক ঘাসের গাদার ওপর একটি কুকুর শুয়ে থাকত। এক ষাঁড়ের খিদে পেলে সে ঘাস খেতে এল। তাকে দেখে কুকুর ভীষণ চীৎকার শুরু করে দিল।

ষাঁড় কুকুরের ভয়ে ঘাস খেতে পারল না।

সে বলল, ওরে হিংসুটে ! তুমি নিজে এই ঘাস খাবে না। অন্যকেও খেতে দেবে না। এই হিংসাতেই তুমি মরবে। এই বলে ষাঁড় চলে গেল।

কুকুর রাত দিন ঘাস পাহারা দেয়। নিজের খাওয়ার কথা ভুলে গেল। না খেয়ে মারা গেল কুকুরটি।

মা বলতেন, এর তাৎপর্য হল, হিংসা আগুনের মত। বাড়ালেই

বাড়ে। যার থেকে উৎপন্ন তাকেই নষ্ট করে। এর থেকে দূরে থাকা উচিত।

*　　　*　　　*

একদিন এক শিকারী বনে শিকার করতে গেল। একটি বড় শুয়োর আর একটি হরিণ মারল সে। দুটিই বেশ ভারী। তাদের বহন করে নিয়ে আসতে প্রায় বেলা শেষ হয়ে এল। শিকারী বেশ লোভী। তাই শিকার দুটি ফেলে যেতে পারল না। তাদের নিয়ে শিকারী একটি আম গাছের নীচে রাতের মত আশ্রয় নিল।

সে আম গাছে থাকত একটি সাপ। সে গাছের পাকা আম খেত।

সাপটি ভাবল সকাল হলেই এই লোকটি সব পাকা আম নিয়ে যাবে। এমন কাজ করতে হবে, যাতে আম নিয়ে না যেতে পারে।

সাপ শিকারীকে কামড়াল। শিকারী রেগে গিয়ে তীর ছুঁড়ে সাপকে মেরে ফেলল। সেও সাপের বিষের জ্বালায় মরে গেল।

ঐ গাছের কাছেই থাকত একটি শিয়াল। সে ভেবেছিল, শিকারী রাত্রে নিশ্চয় মাংস রান্না করে খাবে। তখন সেও কিছু পাবে। মাংস না পেলেও অন্তত হাড়গুলো চেটেপুটে খাবে। কিন্তু শিকারীর মৃত্যু হতে দেখে সে তাড়াতাড়ি গাছের কাছে এল।

এত খাবার এক সঙ্গে পেয়ে শৃগালের মনে আর আনন্দ ধরে না। সে ভাবল, মানুষটাকে স্বচ্ছন্দে একমাস খাওয়া চলবে। হরিণ আর শুয়োরে চলবে আরো দুমাস। সাপটি একদিন খাওয়া চলবে। রাতটা

কোনমতে কাটিয়ে পরদিন সকাল থেকেই সে খাওয়া শুরু করবে বলে ঠিক করল।

এমন সময় হঠাৎ শিকারীর ধনুকটি দেখতে পেল সে। মনে মনে ভাবল, এই ধনুকের গুণটি নিশ্চয় চামড়ার তৈরি। এটি খেলেই রাত কেটে যাবে। সে ধনুকের গুণ স্পর্শ করল। সঙ্গে সঙ্গে গুণ ছিঁড়ে ধনুকের হুল গলায় বিঁধে শৃগাল মারা গেল।

মা বলতেন, এর তাৎপর্য হল. লোভ ও অতি সঞ্চয় করা ঠিক নয়।

* * *

এক দিন এক মৌমাছির ভীষণ জলতেষ্টা পেল। সে নদীতে জল খেতে গেল। কিন্তু হঠাৎ সে জলে পড়ে গেল। নদীতে তখন বড় স্রোত। আর সেই স্রোতে মৌমাছি চলল ভেসে।

একটি ঘুঘুপাখি দেখল মৌমাছিটি বিপদে পড়েছে। নদীর কূলে ছিল একটি গাছ। সে গাছের ডাল জলে নামিয়ে দিল। সেই ডাল ধরে মৌমাছি প্রাণ বাঁচাল।

কিছুদিন পরে ঐ ঘুঘু এক ব্যাধের জালে ধরা পড়ল। মৌমাছি দেখল, যে ঘুঘু তাকে একদিন বাঁচিয়েছিল, সে-ই এখন বিপদে পড়েছে।

মৌমাছি গিয়ে ব্যাধকে কামড়াল। ব্যাধ জ্বালায় অস্থির হয়ে জালের দড়ি ছেড়ে দিল। ঘুঘু পাখিও সঙ্গে সঙ্গে উড়ে গেল।

মা বলতেন, এর তাৎপর্য হল, পরের উপকার করা নিজের মঙ্গলের

উপায় করা। পৃথিবীর সকলেরই বিপদ হতে পারে। উপকার করা প্রত্যেকের উচিত।

*　　*　　*

একদিন এক গাড়োয়ান গাড়ি চালাচ্ছিল। হঠাৎ পথের মধ্যে এক গর্তে তার গাড়ির চাকা আটকে গেল। তখন গাড়োয়ান গাড়িতে বসে ভগবানকে ডাকতে শুরু করল। আর সেই পথ দিয়ে যত লোক যাচ্ছিল, সকলকেই সে কাদা থেকে তার গাড়ির চাকা তুলে দেবার জন্য অনুরোধ করছিল, কিন্তু কেউ তার কথায় কান দিল না।

অবশেষে সেই পথ দিয়ে যাচ্ছিল একজন বৃদ্ধ লোক। সে বলল, "ওরে বোকা নিজের চেষ্টা ছাড়া কোন কাজ হয় না। তুমি গাড়ির চাকায় ঘাড় লাগিয়ে তুলে ধরবার চেষ্টা কর। ঘোড়াকে চাবুক মার। দেখবে তোমার গাড়ি উঠে এসেছে।"

শেষকালে সে নিজেই নেমে এসে কাঁধ দিয়ে গাড়ির চাকা তুলে ধরল। গাড়ি কাদা থেকে উঠল এবং আবার গাড়ি চলতে লাগল।

মা বলতেন, এর তাৎপর্য হল, নিজের চেষ্টাই বিপদ থেকে উদ্ধারের একমাত্র পথ।

*　　*　　*

একটি বিলে অনেকগুলি ব্যাঙ বাস করত। সেখানে একদিন কতকগুলি ছেলে খেলা করতে এল। তারা ঢিল ছুড়ছিল জলে। ব্যাঙরা ভীষণ ভয় পেল।

সাহসী একটি ব্যাঙ জল থেকে উঠে বলল, দেখ ছেলেরা, তোমাদের যা খেলা, আমাদের তা মৃত্যুর কারণও বটে। এই অল্প বয়সে তোমরা এমন নিষ্ঠুর ব্যবহার করছ কেন?

মা বলতেন, এর তাৎপর্য হল, অন্যের সুখ নষ্ট করে আনন্দ করা অন্যায়।

* * *

মাঠে গরু চরাত এক রাখাল ছেলে। সেখানে একদল কৃষক চাষ করত। মাঝে মাঝে ছেলেটি ঠাট্টা করবার জন্য চীৎকার করে উঠত, কৃষক ভাইরা আমার গরুর পালে বাঘ পড়েছে। তোমরা এসে বাঁচাও।

সেই চীৎকার শুনে ছুটে আসত কৃষকেরা। এই রকম কয়েকবার ঘটল। কিন্তু বাঘের দেখা নেই। কৃষকরা ছেলেটার ওপর রেগে গেল।

একদিন সত্যি সত্যি গরুর পালে বাঘ পড়ল। রাখাল আগের মতই কৃষকদের ডাকল। কিন্তু তারা এল না।

বাঘ গরুর পাল নষ্ট করে, রাখালকেও মেরে ফেলল।

মরার সময় দুঃখে রাখাল বলল, হায়, কেন কৃষকদের সঙ্গে রসিকতা করতে গিয়েছিলাম।

মা বলতেন, এর তাৎপর্য হল, যে মিথ্যা বলে, তাকে কেউ বিশ্বাস করে না। সে সত্য বললেও লোকে তা মিথ্যা মনে করে।

* * *

এক বিলের কাছে বাস করত এক বক আর এক কাদাখোঁচা। বিলের মাছ আর পোকা খেত তারা।

হঠাৎ এক বৎসর বৃষ্টি হোল না। বিলের জল গেল শুকিয়ে। কেবল কাদা পড়ে রইল।

বক জল থেকে মাছ ধরে খায়। সে কাদায় যেতে পারে না। এখন তার খাওয়ার খুবই কষ্ট হল। না খেয়ে প্রায় মারা যাওয়ার অবস্থা।

কিন্তু কাদাখোঁচার খাওয়ার কোন কষ্ট হোল না। কাদা থেকে মাছ খেয়ে বেশ সুখেই দিন কাটাতে লাগল।

কিন্তু বক ছিল বেশ চালাক। একদিন সে কাদাখোঁচাকে বলল, দেখ ভাই, বহু বৎসর আমরা এক জায়গায় বাস করছি। কিন্তু আমাদের দুজনে তেমন ভাব হয়নি। এটা তো ঠিক নয়, এস আমরা ভাব করি।

কাদাখোঁচা সরল মনে বকের কথায় রাজী হোল। তখন থেকে তারা দুজন বন্ধু।

কয়েকদিন কেটে গেল।

একদিন বক কাদাখোঁচাকে বলল, দেখ ভাই, বিলের সব জল শুকিয়ে গেছে। না খেয়ে আমার প্রায় মারা যাওয়ার অবস্থা, তুমি যদি আমাকে কিছু খেতে দাও, তবে আমি প্রাণে বাঁচি। আমি তোমার অনুগত হয়ে থাকব। তোমার যদি কখনও বিপদ হয়, তবে, আমিও তোমার উপকার করব। এখন তোমার সাহায্য করবার ক্ষমতা আছে। তুমি পরোপকার কর। এর থেকে বেশী পুণ্য আর কিছুতে নেই। আর যে ব্যক্তি কাতর, তার উপকার করা অবশ্য কর্তব্য।

কাদাখোঁচা দয়াশীল। সে আশ্রিত বককে প্রতিদিন আহার দেয়। বক প্রাণে বেঁচে গেল। কাদাখোঁচা তার ছলনা বুঝতে পারল না।

একবার ভীষণ বৃষ্টি হোল। চারদিক জলে ভেসে গেল। বক মনের আনন্দে মাছ খায়।

কাদাখোঁচার খাওয়া বন্ধ হয়ে গেল। সে জলে গিয়ে খেতে পারে না। মনে মনে ভাবল সে, আমি একসময় বকের উপকার করেছি। বক এখন নিশ্চয় আমার দিকে তাকাবে।

উপকার করা দূরে থাক, বক সবসময় কাদাখোঁচাকে গালি দেয়। কোন দোষ না পেয়ে বক একদিন বলল, ওহে কাদাখোঁচা, তোমার অকারণে নাচ আমার ভাল লাগে না। আমি এই জায়গা ছেড়ে যাচ্ছি।

বক অন্য বিলে চলে গেল।

না খেয়ে মারা পড়ল কাদাখোঁচা।

মা বলতেন, এর তাৎপর্য হল, শঠেরা দুঃসময়ে অন্যের সঙ্গে মিষ্টি কথা বলে বন্ধুত্ব করে। কাজ শেষ হলে প্রতিউপকার দূরে থাকুক, মিথ্যা দোষ দিয়ে উপকারীকে ত্যাগ করে।

*　　　*　　　*

খেঁকশিয়ালী খুবই চালাক। কিন্তু সে মোটেই রসিক নয়। সে ভাবল, প্রতিবেশী বকের সঙ্গে রসিকতা করবে। তাকে একদিন দুপুরে নিজের বাড়ীতে নেমন্তন্ন করলে খেঁকশিয়ালী।

বক নেমন্তন্ন খেতে এল। এসে তো সে অবাক।

সব ঝোলের খাবার রাখা হয়েছে পাতান থালায়। লম্বা ঠোঁটের ডগাটাই শুধু তাতে ডুববে মাত্র।

এদিকে বকের খিদেও পেয়েছে ভীষণ। কিন্তু তার কিছুই খাওয়া হোল না।

খেঁকশিয়ালী সব খাবার চেটে খেতে থাকল। তাই দেখে বকও অস্থির হয়ে পড়ল। বককে খেঁকশিয়ালী জিজ্ঞাসা করল, আমার খাবার তোমার কেমন লাগছে? তোমার খাবার খেতে নিশ্চয়ই ভাল লাগবে বলে আমার মনে হয়। কিন্তু তুমিতো বিশেষ কিছুই খাচ্ছ না। আমার মনে কষ্ট হচ্ছে।

বক বুঝল, খেঁকশিয়ালী রসিকতা করছে। কিন্তু মুখে সে বেশ ভদ্র ব্যবহারই করল। বলল, আমার খেতে বেশ ভালই লাগছে।

ফিরে যাওয়ার সময় বক তাকে নেমন্তন্ন করে গেল। খেঁকশিয়ালী যেতে রাজী হোল।

সেই দিন এল। খেঁকশিয়ালী গেল বকের বাড়ি। খাবার সময় হলে সব খাবার সাজিয়ে দেওয়া হোল। সব খাবারই রয়েছে লম্বা গলাওয়ালা পাত্রে। কুটি কুটি মাংসের ঝোল। সে সব খাবার খাওয়ার কোন উপায় ছিল না খেঁকশিয়ালীর। তার খিদেই বাড়ল শুধু।

বক তার লম্বা ঠোঁট দিয়ে পেট ভরে খেল। পাত্রের গায়ে লেগে থাকা ঝোলটুকুই শুধু চেটে খেল খেঁকশিয়ালী।

বক বলল, আমি বড়ই সুখী হলাম। সেদিন তোমার বাড়ীতে আমি যেমন খেয়েছিলাম, এখানেও ঠিক তেমনি তুমি খাও।

একথা শুনে খেঁকশিয়ালীর মাথা নীচু হয়ে গেল। মনটাও খারাপ। তার একেবারেই খাওয়া জুটল না।

মা বলতেন, এর তাৎপর্য হল, কারো সঙ্গে রসিকতা করবার আগে ভাবা উচিত, নিজের সেই রসিকতা সহ্য করবার ক্ষমতা আছে কি না।

* * *

সিংহ ঠিক করল সে একটি বলদ শিকার করবে। কিন্তু সিংহের থেকে বলদের গায়ে জোর অনেক বেশী। ভয়ে কিছুতেই সে বলদের কাছে যেতে পারল না।

এবার সে চালাকি করল। বলদকে বলল, "ওহে বলদ আমি একটি হৃষ্টপুষ্ট ভেড়ার ছানা মেরেছি। আজ আমার বাড়ীতে তোমার নেমন্তন্ন।"

বলদ রাজী হোল। সে যথাসময়ে সিংহের বাড়ীতে গিয়ে হাজির। সেখানে প্রচুর কাঠ আর বড় বড় মাটির হাঁড়ি দেখে বলদের মনে কেমন সন্দেহ হোল। সে ফিরে চলল।

সিংহ তখন বলদকে বলল, তুমি চলে যাচ্ছ কেন ?

বলদ বলল, আমি তোমার মনের কথা বুঝতে পেরেছি। ভেড়ার বাচ্চার জন্য এত বড় আয়োজনের দরকার হয় না। তার থেকেও বড় অন্য কিছুর জন্য এই ব্যবস্থা।

মা বলতেন, এর তাৎপর্য হল, শত্রুর কথা বিশ্বাস করা এবং তার সঙ্গে বন্ধুত্ব করা বুদ্ধিমানের কাজ নয়।

* * *

একদিন এক নদীর পাড় দিয়ে যেতে যেতে একটি ছেলে হঠাৎ নদীতে পড়ে গেল। সে সাঁতার জানত না। তাই সে ডুবুডুবু হল।

এমন সময় একজন লোক সেই পথে এল। তাকে সাহায্যের জন্য ডাকল ছেলেটি।

লোকটি এবার জলের কাছে গেল। তাকে জল থেকে না তুলে, জলে নামার জন্য তাকে ভর্ৎসনা সুরু করল।

তখন ছেলেটি বলল, দয়া করে আগে আমাকে প্রাণে বাঁচান, তারপর গালি দেবেন।

মা বলতেন, এর তাৎপর্য, বিপদগ্রস্ত ব্যক্তিকে আগে বিপদ থেকে উদ্ধার করে পরে উপদেশ দেওয়া উচিত।

* * *

এক হরিণের ছিল বারোটি শিঙ। একদিন তার ভীষণ তৃষ্ণা পেল। জল খাওয়ার সময় জলের মধ্যে নিজের চেহারা দেখে বিমর্ষ হল সে। তার পাগুলি বেশ সরু। এসব দেখে মনে কষ্ট পেলেও মাথার লম্বা শিং দেখে তার আনন্দের সীমা রইল না।

কিছুক্ষণ পরে সেখানে কয়েকজন ব্যাধ এসে হাজির। ব্যাধদের দেখেই হরিণ পালিয়ে গেল। তারা তাকে বধ করতে পারল না।

হরিণ পর্বতে গিয়ে ঘন বনের মধ্যে ঢুকল। গাছের শাখা ও লতায় তার শিঙ গেল আটকিয়ে। ব্যাধরা তখন তাকে মেরে ফেলল।

মরার সময় দুঃখে হরিণ বলল, হায়, আমি যে শিঙের জন্য গর্ব করেছিলাম, সেই আমার মৃত্যু ডেকে আনল।

মা বলতেন, এর তাৎপর্য হল, সৎ বিবেচনার পর গর্ব করা উচিত।

* * *

বাগানের মালী কথা বলছিল, একটি কাঁটাগাছের সঙ্গে।: গাছ বলল, আমাকে যদি কেউ বাগানে পুঁতে দেয় এবং প্রতিদিন জল দেয়, তবে রাজারাও আমার ফুল দেখে মুগ্ধ হবেন।

মালী কাঁটাগাছকে বাগানের একটি সতেজ জায়গায় এনে লাগাল। গাছের গোড়ায় প্রতিদিন জল দিত দুবার করে। ধীরে ধীরে গাছের কাঁটা বড় হল। শক্ত হল। আশপাশের গাছের উপর ছড়িয়ে পড়ল তার কাঁটা শুদ্ধ ডালপালা। সেই সব গাছের ক্ষতি হল।

যত দিন যায়, কাঁটাগাছের শিকড় সমস্ত বাগান ঘিরে ধরল। কাঁটার ভয়ে বাগানে ঢুকতে আর কেউ সাহস পায় না।

মা বলতেন, এর তাৎপর্য হল, দুষ্টকে আশ্রয় দিয়ে যত সমাদর করা যায়, ততই তার দুষ্টামি বাড়ে; এবং যত উপকার করা যায়, ততই অন্যের অপকার করে।

* * *

একদিন দুই মোরগে প্রচণ্ড লড়াই বেধেছিল। একজন হেরে পালিয়ে গেল। জয়ী মোরগটি আহ্লাদে আটখানা। উঁচু এক বাড়ীর ছাদে পাখা ঝাপটাতে লাগল। অহঙ্কার ফেটে পড়ল তার ব্যবহারে। এমন সময় একটি কুকুর এসে ধরল তাকে।

মা বলতেন, এর তাৎপর্য হল, নিজের শক্তি নিয়ে কারো গর্ব করা উচিত নয়।

* * *

কয়েকটি নেকড়ে বাঘ একটি গর্তে গরুর চামড়া দেখতে পেল। তাদের এই চামড়াটি খুব খাওয়ার ইচ্ছা হল।

কিন্তু গর্তটি ছিল জলে পূর্ণ। চামড়াটাও কাছে ছিল না। নেকড়েরা ভাবল এখন কি করা যায়।

তারা ঠিক করল আগে গর্তের সমস্ত জল খেয়ে ফেলবে। তারপর চামড়া খাবে।

পেট ভর্তি জল খেল নেকড়েরা। বেশী জল খাওয়ায় তারা পেট ফেটে মারা গেল। তাদের আর চামড়া খাওয়া হল না।

মা বলতেন এর, তাৎপর্য হল যাদের অল্পবুদ্ধি, তাদের যা করা উচিত নয়, তাই করে।

* * *

লোকটির গায়ের রঙ বেশ কালো। একদিন সে এক মজার কাণ্ড শুরু করে। সমস্ত জামা কাপড় খুলে গায়ে বরফ মাখতে থাকে।

সেই সময় সেখানে ফর্সা একজন লোক গিয়ে হাজির। সে বলল, ওহে তুমি বরফ মাখছ কেন?

লোকটি উত্তর দিল, আমি ফর্সা হতে চাই।

কিন্তু ফর্সা লোক বলল, দেখ, তুমি নিজের শরীরকে কষ্ট দিও না। তোমার শরীর বরফকে কালো করতে পারে। কিন্তু বরফ তোমার কালো রঙ তুলতে পারবে না।

মা বলতেন. এর তাৎপর্য হল. মন্দ ভালকে মন্দ করতে পারে। কিন্তু মন্দকে ভাল করবার ক্ষমতা কারোর নেই।

* * *

সিংহের বেশী বয়েস হয়ে পড়ায় সে চলাফেরা করতে পারত না। ফলে তার শিকার ধরাও বন্ধ হয়ে পড়ে। খাবার জোগাড় করতে সে ছলনার পথ নিল।

একদিন সে গুহা থেকে বেরোল না। সারাদিন শুয়েই কাটাল। সবাই জানল তার খুব অসুখ।

সিংহ ঠিক করল. যে তাকে গুহার মধ্যে দেখতে আসবে, তাকেই সে ধরে খাবে।

এক খেঁকশিয়ালী দেখতে এল সিংহকে। গুহার মুখে দাঁড়িয়ে প্রণাম জানিয়ে বলল, ওহে. পশুরাজ তুমি কেমন আছ ?

সিংহ বলল, ভেতরে এস না।

খেঁকশিয়ালী বলল, মশায় আগে ভেতরে অনেক গেছে, তার চিহ্ন রয়েছে। কিন্তু বেরিয়ে আসবার একটা চিহ্নও তো দেখতে পাচ্ছি না।

মা বলতেন, এর তাৎপর্য হল, বিবেচনা না করে কোন কাজে হাত দেওয়া উচিত নয়।

*   *   *

কোন এক সময় হরিণের অসুখ হল। তার অনেক পরিজন। তারা দেখতে এল তাকে। হরিণের বাসস্থানে অনেক শুকনো ও সতেজ ঘাস পাতা ছিল। আত্মীয়েরা সে সব খেয়ে ফেলল।

ধীরে ধীরে হরিণের অসুখ সারল। খিদের সময় তার খাবার জুটল না। কারণ আত্মীয়রা সব আগেই খেয়ে গেছে। না খেতে পেয়ে একদিন হরিণ মারা গেল।

মা বলতেন, এর তাৎপর্য হল, যার আত্মীয়-পরিজন বেশী তার দুঃখও অনেক।

* * *

দুটো বলদকে একটা সিংহ তাড়া করে। কিন্তু তারা ভয় পেল না। বরং একসঙ্গে শিং দিয়ে সিংহকে গুঁতো মারতে থাকে তারা। সিংহ কিছুতেই তাদের ক্ষতি করতে পারল না।

তখন চালাকি করে সিংহ বলদদের বলল, তোমরা দুজনে আলাদা হয়ে যাও, আমি কাউকে কিছু বলব না।

বলদ দুটি এই কথাতে দূরে সরে গেল। সিংহ তখন দুজনকেই মেরে ফেলল।

মা বলতেন, এর তাৎপর্য হল,—ঐক্য থাকলে কেউ ক্ষতি করতে পারে না। অনৈক্য হলেই ক্ষতি।

* * *

ব্যাধের ভয়ে পালিয়ে হরিণ গিয়ে লুকাল এক গর্তে। কিন্তু এক সিংহ সেখানে হরিণকে বধ করল। মরবার সময় হরিণ বলল, হায়,

আমার কি কপাল! আমি মানুষের হাত থেকে পালাতে গিয়ে প্রবল আর একজনের হাতে পড়লাম।

মা বলতেন, এর তাৎপর্য হল, সামান্য ভয়ে ভীত হলে, বড় বিপদে পড়তে হয়।

* * *

এক খরগোশ কোন এক বাঘিনীর কাছে গিয়ে বলল, প্রতি বৎসর আমার অনেক সন্তান হয়। তোমার জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত একটি অথবা দুটি সন্তান হয়।

বাঘিনী বলল, আমার দু-একটি সন্তান হয় বটে, কিন্তু তারা তোমার অনেক সন্তান থেকেও শ্রেষ্ঠ।

মা বলতেন, এর তাৎপর্য হল, দু-একটি উত্তম সন্তান অনেক অধম সন্তান অপেক্ষা ভাল।

* * *

একটা মশা গিয়ে বসল ষাঁড়ের শিঙের ওপর। সে ভাবল, আমি এসে বসায় ষাঁড়ের হয়ত কষ্ট হচ্ছে। বলল, ওহে ষাঁড়, আমি বসাতে যদি তোমার অসুবিধা হয়, তবে বল, আমি অন্য কোথাও চলে যাচ্ছি।

ষাঁড় বলল, ওহে মশা, তুমি কিসে বসেছ তা আমি বুঝতেও পারছি না। কাকে ব্যথা দিচ্ছ, কার অসুবিধা করেছ, তাও জানতে পারলাম না।

মা বলতেন, এর তাৎপর্য হল, যে নিজের খ্যাতি ও শক্তির অভিমান করে, সে অতি তুচ্ছ।

০ * *

একজন মহিলার ছিল একটি সুন্দর হংসী। সে প্রতিদিন একটি রূপোর ডিম পাড়ত। মহিলা একদিন ভাবল, যদি আমি এর খাবার বাড়িয়ে দিই, তবে নিশ্চয় প্রতিদিন দুটি ডিম দেবে। তারপর হংসীর খাবার বেশী দিতে সুরু করল সে। হংসী অতিরিক্ত খাওয়ায় পেট ফেটে মারা পড়ল।

মা বলতেন, এর তাৎপর্য হল, বেশি লাভের আশায় নিজের পুঁজি নষ্ট করা উচিত নয়।

* * *

মা আমাদের বলেছিলেন যে একজন মেয়ে লোক কাশীতে তীর্থ করতে গিয়েছিল। তীর্থ করতে করতে একজন সাধুলোককে অন্যান্য সমস্ত লোকদের মন্ত্র দিতে দেখে তারও ইচ্ছা হল যে আমিও এর কাছে মন্ত্র নিই। তারপর তার কাছে গিয়ে মেয়েলোকটি বলল, "বাবা" আমায় তুমি মন্ত্র দাও না। মেয়েলোকটির এইরূপ আগ্রহ দেখে লোকটিও বিনা বাক্যব্যয়ে তাকে মন্ত্র দিল।

মেয়েলোকটি মন্ত্র নিয়ে বললে, "বাবা আমি বড় গরীব, আমার একটা কিছু নেই যে, তোমাকে আমি দিই। কিন্তু মন্ত্র নেওয়ার সময় গুরুকে কিছু না দিলে ভীষণ পাপ হয়। এই বলেই মেয়েলোকটি তার একটা চোখ হাত দিয়ে তুলে গুরুকে ধারণ করতে বলল। এধারে গুরু তো ব্যাপার দেখে অবাক। মেয়েলোকটি দিয়েই ওখান থেকে সেইমাত্রই চলে গেল। একটুও দাড়াল না।

* * *

মা আমাদেরকে মহাভারতের হিড়ম্ব রাক্ষস বধ ও বক রাক্ষস বধের ঘটনা সুন্দরভাবে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন।

পাণ্ডবেরা গোপনে জানতে পেরেছিলেন,—কৃষ্ণাচতুর্দশীর রাত্রে পুরোচন ঘরে আগুন লাগাবে। কিন্তু পুরোচন সেদিন সন্ধ্যারাত্রেই ঘুমিয়ে পড়ল। ভীম পুরোচনের ঘরে আগুন লাগিয়ে দিলেন। দ্রুত পায়ে এবারে আর একটি ঘরে আগুন লাগানো হ'ল—সেখানে ছিল ঘুমন্ত পাঁচজন ব্যাধ ও তাঁদের মা। কুন্তীদেবীর চতুর্দশীব্রত উপলক্ষ্যে দরিদ্র নারায়ণ ভোজন হয়েছিল। খুব বেশী আহার করার দরুণ এদের আর বাড়ি ফিরবার শক্তি ছিল না ব'লে সেই রাতে তারা ঐ গৃহের

বারান্দায় শুয়ে পড়েছিল। এদিকে যখন গৃহদাহ হচ্ছে—পাঁচ ভাই ও কুন্তী খুব সতর্কভাবে সুড়ঙ্গ পথ ধ'রে পালিয়ে গেলেন। এদিকে পরদিন সারা নগরে খবর ছড়িয়ে পড়ল, কুন্তী ও পাণ্ডবেরা পুড়ে মারা গেছেন। হস্তিনাপুরে যখন এই খবর পৌঁছাল, ধৃতরাষ্ট্রও মায়া কান্না কাঁদতে লাগলেন।

এদিকে পাঁচ পাণ্ডব ও মাতা কুন্তী সুড়ঙ্গপথ বেয়ে বেয়ে অন্ধকার রাতে গভীর বনে উপস্থিত হ'লেন।

সেই বনে থাকতো হিড়িম্ব আর হিড়িম্বা রাক্ষস-রাক্ষসী। হিড়িম্বা পাণ্ডবদের কাছে এসে দেখে ভীম ছাড়া আর সবাই ঘুমিয়ে আছে। ভীমকে দেখে তার মন মায়ায় ভরে উঠল এবং হিড়িম্বর উদ্দেশ্য সবই ফাঁস ক'রে দিল। কিন্তু ভীম হিড়িম্বর নাম শুনে ভয় পেল না। হিড়িম্বার ফিরতে দেরী হচ্ছে দেখে হিড়িম্ব সেখানে এসে ভীমকে দেখেই আক্রমণ করল। কিন্তু মুহূর্তের মধ্যে ভীমের হাতে হিড়িম্ব বধ হ'ল। হিড়িম্বাকে মারতে গেলে সে বলল,—'আমায় মেরো না। আমি তোমায় বিয়ে করব ঠিক করেছি।' ভীম এই কথা শুনে রেগে গিয়ে তাকে মারতে উঠলে যুধিষ্ঠিরের ইচ্ছায় শেষ পর্যন্ত তাকে বধ না ক'রে সেই রাতেই হিড়িম্বাকে গন্ধর্ব মতে বিয়ে করল। ভীম হিড়িম্বাকে নিয়ে অন্যত্র চলে গেল। যথাসময়ে ঘটোৎকচ নামে একটি পুত্র জন্মালো তাঁদের। জন্মেই সে মহা বীরপুরুষে পরিণত হ'ল।

বনের মধ্যে বহু কষ্টে পাণ্ডবদের দিন কাটতে লাগল। পথে ব্যাসদেবের পরামর্শে তাঁরা একচক্রা নগরে এক ব্রাহ্মণের বাড়িতে আশ্রয় নিলেন।

ব্রাহ্মণের বাড়িতে পাঁচ ভাই মাকে নিয়ে বাস করতে লাগলেন। তাঁদের মাথায় জটা, পরণে গেরুয়া। তাঁরা সারাদিন ভিক্ষা ক'রে যা আনেন—মা তার অর্ধেক ভীমকে আর বাকিটা নিজে ও চারপুত্রে মিলে

আহার করেন। একদিন চার ভাই ভিক্ষায় গেছেন। বাড়িতে আছেন ভীম আর কুন্তী। এমন সময় ব্রাহ্মণের গৃহে কান্নার রোল উঠল। কুন্তী গিয়ে তাঁদের দুঃখের কারণ জানতে চাইলে ব্রাহ্মণ বললেন,—"এই নগরের কাছে বক নামে এক রাক্ষস থাকে। নগরবাসী প্রতি গৃহস্থ থেকে পালা ক'রে তার খাবার জোগায়। আজ আমাদের পালা। যে লোক খাবার নিয়ে যাবে—বক তাকেও খাবে।" ভীমের কথা বলে কুন্তী বললেন,—'আমার এই ছেলের গায়ে রাক্ষসের চারগুণ বল। সে রাক্ষসের কাছে যাবে। চিন্তা করবেন না। রাক্ষস বধ ক'রে সে নিরাপদে ঘরে ফিরে আসবে। ভীম খাবার নিয়ে, বক যে বনে থাকে, সেই বনে গেলেন। রাক্ষসের গর্জনে গোটা বন কেঁপে উঠল। মহাবেগে বকরাক্ষস ভীমের কাছে এগিয়ে এসে দেখে—ভীম তারই ভাত গব্ গব্ ক'রে খেয়ে শেষ করছে। ভীমের কাণ্ড দেখে ক্ষেপে গিয়ে বকরাক্ষস হাতের কাছে যা পেলো তাই দিয়ে ভীমকে প্রহার করতে লাগল। খাওয়া-দাওয়া শেষ ক'রে ভীম বকরাক্ষসকে বার কতক ঘুরপাক দিয়ে এমন আছাড় দিলেন যে, রাক্ষস বমি করতে করতে মারা গেল। ভীম এই ভাবে বক রাক্ষস বধ ক'রে সেই নগর রক্ষা করলেন।

*　　*　　*

গিরিশ ঘোষের এবং সাধু দুর্গাচরণ নাগের মা-এর প্রতি কি ভক্তি এবং মাও যে ছেলের জন্য কত ব্যাকুল হয়, তা মা আমাদেরকে তাঁদের জীবনের দুই-একটি ঘটনার দ্বারা বুঝিয়ে দিয়েছিলেন—

গিরিশ ঘোষের কলেরা হয়েছে। বাঁচবেন সে আশা নেই। গিরিশচন্দ্র নিজেও জানেন তিনি আর বাঁচবেন না। এমন সময় তিনি দেখলেন একজন নারী এসে দাঁড়ালেন তাঁরই মাথার কাছে। ছোটবেলায়

মা মারা গেছেন। মার কথা মনে নেই। তাহলে কি এই নারীই তাঁর মা? তিনি কি তাহলে শেষ সময়ে ছেলেকে কোলে তুলে নিয়ে যাবেন বলে এসেছেন? কিন্তু ভুল ভাঙল তাঁর। এই নারী কি যেন তাঁর মুখে দিলেন। বললেন, এই মহাপ্রসাদ খেয়ে নাও। খেলেই ভালো হয়ে যাবে।

গিরিশচন্দ্র আর খুঁজে পেলেন না সেই নারীকে কোথাও। চেতনা ফিরে পেয়েছেন তিনি। কোথায় সেই নারী? ঘরে তো কেউ নেই। অথচ তার মুখে যে এখনও মহাপ্রসাদ রয়েছে। অবাক ঘটনা।

ভালো হয়ে গেলেন তিনি। অথচ সেই নারীকে খুঁজে পান না তিনি কোথাও। বারবার ছুটে যান কালীঘাটে। ডাকেন, মা মা বলে।

একদিন স্বামী নিরঞ্জনানন্দ উপদেশ দিলেন গিরিশ ঘোষকে। তুমি মার কাছে যাও।

মা!

হ্যাঁ। জীবন্ত মা! সারদা মার কাছে যাও।

গিরিশ ঘোষ কোনদিন সারদা দেবীর মুখের দিকে তাকিয়ে দেখেননি। নিজের মনের পাপ নিয়ে তিনি তাকাতে পারতেন না মায়ের মুখের দিকে।

এবার নিরঞ্জনানন্দ স্বামীর কাছে হতে শুনে গিরিশ ঘোষ ঠিক করলেন তিনি জয়রামবাটী যাবেন। শহর কোলকাতা ছেড়ে এলেন জয়রামবাটী। মাকে দেখলেন। দেখেই চমকে উঠলেন তিনি। সে-কী! এঁকেই তো তিনি দেখেছেন রোগশয্যায়।

গিরিশ ঘোষ লুটিয়ে পড়লেন মার পায়ের কাছে।

তুমি আমার কেমন মা? গুরুপত্নী, না পাতানো মা?

সহজভাবে জবাব দিলেন সারদা, কল্পনাও নই, ও কারো মাও নই। আমি তোমার সত্যিকারের মা, গিরিশ।

ছেলে গিরিশ পেলেন তার সত্যিকারের মা সারদার কাছ থেকে স্নেহ, পেলেন আদর।

বেলুড়ে আবার ফিরে এসেছেন মা। ভক্তরা দেখতে আসছে তাঁকে দলে দলে। বড় বিরক্ত করে মাকে। তাই নিয়ম করে দেওয়া হল, বিশেষ সময় ছাড়া মার সংগে দেখা করা চলবে না।

অসময়ে একদিন দেখা করতে এলেন সাধু দুর্গাচরণ নাগ। রোগা শরীর। ভালো করে পথ চলতে পারেন না। কাঁপতে কাঁপতে সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠেন। তবু মাকে তিনি দেখবেনই। মায়ের প্রতি তার অসীম ভক্তি।

মায়ের সংগে দেখা হবে না। একথা দুর্গাচরণ শুনতে রাজী নন। তিনি সিঁড়ির উপর মাথা ঠুকতে লাগলেন। মনে হল এখনই বুঝি কপাল ফেটে রক্ত বের হবে। স্বামীজীর নিজের বারণ পর্যন্ত শুনবেন না দুর্গাচরণ, শেষ পর্যন্ত ঝি-এর মুখে খবর পেলেন সারদা। মা থাকতে পারলেন না। ডেকে পাঠালেন ভক্তকে। যোগানন্দ ধরে নিয়ে এলেন দুর্গাচরণকে। মা দেখলেন কপাল ফুলে গেছে, চোখে জল। ঝাপসা চোখে ভালো করে দেখতেও পারছেন না। মুখে শুধু 'মা' ডাক। পাগল যেন!

মা এসে ধরলেন দুর্গাচরণকে। কাছে এনে বসালেন। নিজের কাপড়ের আঁচল দিয়ে মুছিয়ে দিলেন চোখের জল।

ছেলেকে তো মা এমনি করেই স্নেহ করেন। এমনি করেই মুছিয়ে দেন চোখের জল। ভুলিয়ে দেন ছেলেকে সব দুঃখ, সব জ্বালা।

মার খাবার ব্যবস্থা হয়েছিল। মা সামান্য কিছু আহার করে

বাকীটা খাইয়ে দিলেন দুর্গাচরণকে। দুর্গাচরণের কিন্তু তখন খাওয়ার দিকেও মন নেই—তার মুখে শুধু 'মা মা' ডাক।

বৃদ্ধ দুর্গাচরণ কি মা'র কাছে একেবারেই শিশু ?

বীর সাধক বিবেকানন্দ ফিরে এসেছেন দেশ-বিদেশ ভ্রমণ করে। মা'র কাছে এসে বললেন, মা আজকাল আমরা সবাই যেন উড়ে যাচ্ছি।

'দেখো, আমাকেও আবার উড়িয়ে দিও না যেন।' শ্রীমা হাসতে হাসতেই জবাব দিলেন বিবেকানন্দকে।

বিবেকানন্দ কেঁপে উঠলেন। 'তোমাকে উড়িয়ে দিলে থাকব কি নিয়ে মা ?'

সারদামণি তখন কামার পুকুরে।

কলকাতা থেকে গিরিশ ঘোষ চিঠি লিখলেন মা'র কাছে। মা'র কাছে তাঁর অনুরোধ, মা যেন এবার পূজোর সময়ে তাঁর বাড়ীতে আসেন।

গিরিশ ঘোষ নিজের বাড়ীতেই দুর্গাপূজো করবেন এ বছরে।

মার শরীর তেমন ভালো নেই। তাই জানালেন, তিনি যেতে পারবেন না কলকাতায়। কথাটা শুনে গিরিশ ঘোষের মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল। মা না এলে কিসের পূজো, কিসের আনন্দ।

ভক্ত সন্তানের ডাকে মা কিন্তু চুপ করে বসে থাকতে পারলেন না। শেষ পর্যন্ত কলকাতা আসবেন ঠিক করলেন।

গিরিশ ঘোষ এ খবর না পেলেও আরও অনেক ভক্ত জানতে পেরেছিলেন এ খবর। ললিত আর মাষ্টারমশাই মাকে নিতে বিষ্ণুপুরে চলে এসেছিলেন আগে থেকেই।

মা অবাক। শুধোলেন, তোমরা এখানে কেন বাবা ?

কলকাতায় দাঙ্গা হাঙ্গামা চলছে। হঠাৎ গিয়ে কোন বিপদে পড়বেন, তাই আমরা নিয়ে যেতে এসেছি।

হাওড়া পৌঁছাতে সান্ধ্য হয়ে গেল। সেখানে আরও কয়েকজন ভক্ত অপেক্ষা করছিলেন। ঘোড়ার গাড়ী ভাড়া করা হল। বাগবাজার যেতে হবে। গঙ্গার ধার দিয়ে গাড়ি এগিয়ে চলল কুমোরটুলির দিকে। কুমোরটুলি হয়ে বাগবাজারে বলরাম বোসের বাড়ি যাবেন তিনি।

গিরিশ ঘোষ ঠিক করেছিলেন, মা না এলে তিনি চণ্ডীমণ্ডপে যাবেন না। মা এসেছেন খবর পেয়ে নতুন জীবন পেলেন তিনি।

মাকে নিমন্ত্রণের কথা মনে করিয়ে দিয়ে ফিরে এলেন গিরিশ ঘোষ খুশী মনে।

বিবেকানন্দ বলেন মা সারদা জীবন্ত দুর্গা। বলরাম বোসের বাড়িতে সেই জীবন্ত দুর্গা দেখার জন্য ভিড় জমে গেল।

সপ্তমী পূজো। দলে দলে লোক আসছে মাকে দেখতে। প্রণাম করবে, পুজো করবে মাকে। সারা দেহ কাপড়ে ঢাকা। মা শুধু পা দুখানি খোলা রেখে দাঁড়িয়ে আছেন। কেটে যায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা। লোকের পূজো আর শেষ হয় না। তিনি দাঁড়িয়েই রয়েছেন একই-ভাবে। দাঁড়িয়ে থাকতে কষ্ট হচ্ছে, তবু নিরুপায় তিনি।

পরদিন অষ্টমী পূজো। সেদিনও ঐ একই অবস্থা। সন্ধিপূজো আরম্ভ হতে আর বেশী দেরী নেই। মা ঠিক করলেন গিরিশের বাড়ি যাবেন এবারে। ফুল আর বেলপাতার পাহাড় জমে গেল যেন সেখানে। তবু ভক্তের আসার শেষ নেই।

মা ঠায় দাঁড়িয়ে আছেন মাটির প্রতিমার মতন।

মার জ্বর হল। শরীরে আর কুলায় না। গিরিশ খবর পেলেন, মার জ্বর এসেছে সুতরাং তিনি আসতে পারবেন না। গিরিশ ভেঙে পড়লেন হতাশায়। 'মা মা' বলে ডাকতে থাকেন তিনি পাগলের মতই।

গিরিশের এ ডাক এসে পৌঁছাল শ্রীমার কাছে। মাঝ রাতে তিনি উঠে বসলেন বিছানায়। ডেকে তুললেন গোলাপ-মাকে। বললেন, আমি যাবো।

'সে কি, জ্বর গায়ে এত রাতে তুমি যাবে কোথায়?' গোলাপ-মা অবাক।

সারদামণি বললেন, গিরিশের বাড়ি যাব। আমি এখন বেশ ভালো আছি।

বলরাম বসুর বাড়ির পশ্চিমদিকের সরু গলি ধরে মা চলতে শুরু করেছেন। পথ চলতে কষ্ট হয় তাঁর। শরীর টলে, পা কাঁপে, তবু এগিয়ে চলেন, ভক্তের ডাককে তিনি এড়িয়ে যাবেন কি করে?

গোলাপ মা ছুটে গিয়ে মাকে ধরলেন। মাকে সাহায্য করতে লাগলেন পথ চলায়।

কিন্তু রাত হয়েছে অনেক। তাই খিড়কির দরজা বন্ধ। সদর দরজা দিয়ে ঘুরে এসে মা ঘরে ঢুকলেন। বললেন, আমি এসেছি গিরিশ!

পূজো মণ্ডপ জুড়ে সংগে সংগে যেন সাড়া পড়ে গেল। মেয়েরা উ দিল। এত রাতে ঝিমিয়ে পড়া মণ্ডপের আলো এখন যেন ঝলমল্ করে উঠল। কে বলবে তখন এতরাত। পূজো বাড়ী আনন্দে যেন মেতে উঠল।

মা দেবী প্রতিমার মত স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে সমাধিস্থা হলেন। সবাই অঞ্জলি দিল, মায়ের পায়ে। সে এক অপরূপ দৃশ্য! পূর্ণ হল ভক্ত গিরিশ ঘোষের মনের বাসনা।

আমার কথা

মা যে কত মধুর, কত সুন্দর, তা আমরা ছোটবেলায় মোটেই বুঝতে পারি না। মা ডাকের কি মাহাত্ম্য, তা আমরা পরে বুঝতে পারি।

আমাদের নানারকম জ্বালা যন্ত্রণা 'মা' শব্দ উচ্চারণের সাথে সাথেই যখন ভাল হয়ে যায়, তখন আমরা বুঝতে পারি মা-এর মাহাত্ম্য। তাই কবি বলেছেন—

মা নামটা যে বড়ই মিঠাই।
মা বলতে জীবের সর্ব দুঃখ ঘোচে।

দাঁত থাকতে দাঁতের মর্ম কি তা আমরা যেমন অনেকেই বুঝতে চাই না তেমনি অনেকে আমরা মা থাকতেও মায়ের আসল মূল্য বুঝতে পারি না। মায়ের আসল রূপ বুঝতে পারি না। যখন কোন কাজে আমরা বাধাপ্রাপ্ত হয়ে মায়ের কথা স্মরণ করে ঐ কাজে সফল হই, তখন আমরা বুঝতে পারি যে, মা এক অমূল্য জিনিষ, তাই মায়ের সাথে কোন কিছুরই তুলনা চলে না এই পৃথিবীতে।

মা কত দুঃখ কষ্ট সহ্য করে আমাদের লালন পালন করে বড় করেন, সুন্দর করে তোলেন। মা সব সময়েই চান যে তাঁর সন্তান যেন সমাজে একজন সুপ্রতিষ্ঠিত মানুষ হতে পারে। তাঁর সন্তানের স্বাস্থ্য ও মন যেন সব সময়েই ভাল থাকে—তার বিপদ যেন কোন সময়েই না আসে। তার জন্য মা সব সময় সব রকম ত্যাগ স্বীকার করে থাকেন। তাই মা আমাদের তুলনাহীন। তা আমরা বড় হয়ে বুঝতে পারি। তাই মায়ের ঋণ কেউ শোধ করতে পারে না এই পৃথিবীতে।

আমার মা—আমাদের জন্য কত কষ্ট স্বীকার করে আমাদের বড় করে তুলেছেন, তার সামান্য এখানে লিপিবদ্ধ করলাম।

আমাদের মায়েরা তিন বোন ছিলেন। মা ছিলেন তাঁদের মধ্যে কনিষ্ঠা। মায়েদের কোন ভাই ছিল না। তাই মায়ের বাবা ও মা নিজেদের ছেলে ও মেয়েকে, উভয়ের মতন বড করে তুলবেন, পরিকল্পনাও করেছিলেন। মায়ের বাবা অর্থাৎ আমাদের দাদু তখনকার দিনে এক বড় কোম্পানিতে কাজ করতেন। তখন তাঁর মাসিক বেতন ছিল মাসিক ১৫০ টাকা। তখন তাঁদের সংসার ছিল সুন্দর ও স্বচ্ছল। কিন্তু বেশীদিন তাঁরা সুখে কাটাতে পারলেন না—হঠাৎ মার বাবা হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান।

তখন তাঁদের সংসারে নেমে এল ঘন অন্ধকার। দাদুই ছিলেন সংসারের একমাত্র উপার্জনশীল। তখন আমার মায়ের বয়স খুবই অল্প।

দিদিমার উপর সংসার পরিচালনার ভার এল—কিন্তু দিদিমা তখন অসহায়। বাধ্য হয়ে দিদিমাকে তাঁর মায়ের বাড়ীতে যেয়ে উঠতে হলো তিন মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে। মায়ের মামাদেরও অবস্থা খুব একটা স্বচ্ছল নয়—তবু কষ্ট করে তারই মধ্যে মায়েদের দিন কাটাতে লাগল।

তাই মায়েদের পড়াশোনা করার সুযোগ খুব একটা হয়নি। সারাদিন সংসারে কাজ করে বাকী সময়টুক রামায়ণ-মহাভারত গীতা ইত্যাদি পড়ে শোনাতেন বাড়ীর বড়দের।

মায়ের বড়দিদির বয়স যখন ৭ বৎসর তখন তিনি হঠাৎ কালাজ্বরে মারা যান। দিদিমা আবার শোক পেলেন। মা বলতেন—মায়ের বড়দিদিই ছিলেন খুবই বুদ্ধিমতী। তিনি মৃত্যুর কয়েক ঘণ্টা আগেও মামাদের বলেছিলেন আমার মা ও বোনেদের যেন কোন রকম অযত্ন না হয়।

মায়ের মেজদিদির ৯ বৎসর বয়সে এক স্কুল-মাস্টারের সঙ্গে বিবাহ হয়। তখন মাস্টারদের মাহিনা ছিল খুবই কম। এই অল্প বেতনের মধ্যেও তিনি কিছুটা দিদিমার কাছে পাঠাতেন যাতে মা ও দিদিমার কোন অসুবিধা না হয়। বাকী টাকায় নিজের সংসার চালাতেন।

তারপর আমার মায়ের বয়স যখন ১০ বৎসর তখন বিবাহ হয়। আমাদের বাবা কলকাতায় থাকতেন, মাকেও কলকাতায় আসতে হলো দিদিমাকে একা রেখে দিয়ে তাঁদের বাড়ীতে, তাতে মায়ের খুব কষ্ট হতো দিদিমার জন্য। মাঝে মাঝে দিদিমার কাছে গিয়ে মা দিদিমার সুবিধা অসুবিধা দেখতেন। কিন্তু আমাদের বাবা ছিলেন খুব কড়া মানুষ। তিনি মাকে বেশী দেশের বাড়ীতে যেতে দিতেন না, তাই মাকে মুখ বুজে কষ্ট সহ্য করতে হতো। আমাদের মা'র মন সব সময়েই দেশের দিদিমার দিকে পড়ে থাকত।

আমাদের মায়ের পড়াশোনার সুযোগ প্রথম দিকে হয়নি বলে, মা শ্বশুর বাড়ীতে এসে কিছু কিছু পড়াশোনা করতেন। মা অবসর সময়ে ঠাকমা পিসীমাদের সন্ধ্যার পর রামায়ণ-মহাভারত পড়ে শোনাতেন। মায়ের রামায়ণ-মহাভারত শোনাতে শোনাতে প্রায় মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল।

মাকে আমরা প্রায়ই রামনাম করতে দেখেছি। কোথাও রামনাম হলে মা কান পেতে শুনতেন। আমাদের মা নানা-রকম উপদেশ দিয়ে আমাদের শিক্ষা দিতেন গল্পের ছলে। সংসারে কোন রকম কষ্ট দেখা দিলে তিনি বলতেন, সীতা কত কষ্ট সহ্য করেছেন আর আমরা এটুক কষ্ট সহ্য করতে পারবো না। আমাদের মায়ের সহ্য শক্তি ছিল অসাধারণ। আমরা তিন ভাই ও দুই বোন ছিলাম। বাবা ও মাকে নিয়ে আমরা সংসারে ছিলাম মোট সাত জন। মা আমাদের সংসারে নিজ হাতেই সব করতেন। মা আমাদের সুবিধা অসুবিধার দিকে সব সময় লক্ষ্য রাখতেন। মা আমাদের পড়াশোনার দিকে সমান দৃষ্টি

রাখতেন। আমরাও মা ছাড়া থাকতে পারতাম না। মা আমাদের জন্য মুখ বুজে কষ্ট সহ্য করতেন।

আমার দাদার বয়স যখন ২০ বৎসর তখন বাবা দাদার 'কুষ্ঠি' বড় পণ্ডিতকে দেখতে বলেছিলেন—তিনি দাদার কুষ্ঠি বিচার করে বলেছিলেন, দাদার নাকি ২২ বৎসর বয়সে ভীষণ ফাঁড়া আছে। এ থেকে রেহাই পাওয়া নাকি সম্ভব নয়। এই কথা মা বাবার মুখে শুনে আর ঠিক থাকতে পারেননি। মা তখন থেকে ঠাকুরের কাছে ধর্না দিতে লাগলেন যাতে ছেলের বিপদ কেটে যায়। মা ঠাকুরের কাছে এই বলে প্রার্থনা করতেন যে তুমি আমাকে নিয়ে নাও ঠাকুর, আমার ছেলেকে নিও না। মায়ের এই স্নেহ এবং ভালবাসা আমরা কোনদিন ভুলতে পারবো না। মা-বাবার মত জিনিষ নাই। তাঁদের স্নেহ-ভালবাসা কোন কিছুর সাথেই তুলনা চলে না।

আমাদের মা প্রতিবেশী সকলকেই ভালবাসতেন নিজের ছেলেমেয়ের মত। মা প্রতিবেশী সকলের সাথে সব সময় ভাল ব্যবহার রাখতেন। মা প্রতিবেশীদের যখন যা প্রয়োজন তখন তাই সাধ্যমত সাহায্য করতেন। মা নিজের সংসারের কথা ভুলে গিয়ে সেবা করতেন, যখন কোন প্রতিবেশী বিপদে পড়তেন।

মা প্রায়ই সংসারের চাল-ডাল দিয়ে প্রতিবেশীদের সাহায্য করতেন। মা নিজে কখনও ভাল জামা-কাপড়ও পরতেন না—মা প্রতি শীতে যাদের শীতবস্ত্র না থাকত তাদেরই সাধ্যমত সাহায্য করতেন, মা যাদের পরনে বস্ত্র থাকতো না তাদের বস্ত্র দিয়ে সাহায্য করতেন।

মা আমাদের উপদেশমূলক শিক্ষা দিতেন। মা আমাদের সবসময় বলতেন প্রত্যেকের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করতে। মা বলতেন, কোন লোক মনে দুঃখ পায় বা কষ্ট পায় এমন কথা যেন আমরা না বলি।

মা নিজের সন্তানের সঙ্গে অপর সন্তানের কোন পার্থক্য রাখতে

চাইতেন না। মাকে সেইজন্য তখনকার প্রতিবেশীরা যেমন ভালবাসতেন তেমনি ভক্তিশ্রদ্ধাও করতেন। তাঁরা কোন ভাল কাজ করার আগে মায়ের কাছে পরামর্শ নিতেন। মা তাঁদের সৎ পরামর্শ দিয়ে সেই কাজ যাতে সফল হয় তার ব্যবস্থাও করে দিতেন। মা সেইজন্য ছিলেন সর্বজন-শ্রদ্ধেয়া।

আমাদের মা মাত্র ৪০ বৎসর বয়সে ইহলোক ত্যাগ করে চলে যান। আমার বয়স তখন ১৫ বৎসর মাত্র। মা আমাদের যে কত ভালবাসতেন এবং আমাদের বাড়ীর সবাইকে কি ভাবে আনন্দে রেখেছিলেন তাহা ভাষায় বলা যায় না। নিজের কোন সুখ চাননি, সারাদিন সংসারের সবাইয়ের মঙ্গলের জন্য খেটে গেছেন।

মা যেদিন আমাদের ছেড়ে চলে যান সেদিনটা ছিল ৩রা ডিসেম্বর। ১৯৪৭ সাল, তখন ছিল বাংলার অগ্রহায়ণ মাস। এই অগ্রহায়ণ মাসটা ছিল বিশেষ স্মরণীয়, কারণ মা এই মাসে জন্মগ্রহণ করেছেন। মায়ের এই মাসেই বিবাহ হয়। এবং ভাগ্যের কি পরিহাস মা এই স্মরণীয় মাসেই মারা গেলেন। এই মাসটা আমাদের কাছে আরও স্মরণীয় করে তুললেন মা।

মা আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন ঠিকই—এখন আমাদের বাড়ীতে অনেক লোকের সমাগম হলেও মায়ের শূন্যতা কিন্তু শূন্যই থেকে গেছে। মায়ের সমান আমরা কাউকেই এখনও পাইনি।

আমরা কোন কাজ করার আগে মায়ের কথা স্মরণ করেই কাজ সুরু করি, কারণ মা আমাদের বলতেন কোন কাজ করার আগে চিন্তা করবে—কাজ করে নয়। তাই মায়ের উপদেশমূলক শিক্ষা আমরা সব সময় স্মরণ করি এবং মায়ের কথানুযায়ী কাজ করে আমরা সেই কাজে সফলও হই। তাই আমরা মায়ের সমান কাউকে খুঁজে পাইনি। তাই আমরা মায়ের ঋণ কেউই পরিশোধ করতে পারব না

আমি যাঁর কাছে বিশেষভাবে ঋণী, তিনি হচ্ছেন পরম শ্রদ্ধেয় পরম হৃদয়বান শ্রীনির্মলেন্দু রায় বর্মন মহাশয়। "শিশু মনে মায়ের প্রভাব" এই বই প্রকাশনার ব্যাপারে তিনিই প্রথম আমাকে বলেন এবং তিনি নিজেই এই বইটি যাতে দ্রুত প্রকাশ পায় তার জন্য তিনিই সবরকম ব্যবস্থা করেছেন। মূলতঃ তাঁরই চেষ্টায় এই বইটি প্রকাশ সম্ভব হল। সেইজন্য তাঁর কাছে আমি চির-কৃতজ্ঞ। এই বইটির মুখবন্ধও তিনিই লিখেছেন।

এই বইটির প্রকাশক—শ্যামল ঘোষ, বইটি সুন্দর ভাবে প্রকাশ করে আমাকে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ রেখেছেন।

বইটি যাতে সুন্দর হয় ও ভক্তিনম্র স্নেহের পরিচয় পাওয়া যায় তার জন্য নানারকম মতামত দিয়ে পূরবী রায়বর্মন ও মনীষা মুখোপাধ্যায় আমাকে সাহায্য করেছেন। সেই জন্য তাঁদের কাছেও আমি ঋণী।

এই বইটির প্রচ্ছদ করেছেন শ্রীহরেশ্বর কাহালী। ভুলবশতঃ ছাপা হয়েছে মাণিক সরকার—তার জন্য দুঃখিত।

বইটি ছোট বড় সকলের যাতে ভাল লাগে সেইভাবেই মায়ের কথা তুলে দেওয়া হয়েছে। বইটি সকলের ভাল লাগলে আমি আমার শ্রম সার্থক মনে করব।

গ্রন্থকার